# ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

স্বাধীনতা দিবসের নিবেদন

কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ : গঠনশৈলী ও স্থাপত্য উৎস
কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম
উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) ও বাংলাদেশের অর্থনীতি
মোঃ ফজলুল হক
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার স্বরূপ
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
বাঙালির দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনে দ্রাবিড় প্রভাব
অশোক বিশ্বাস
ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি
সুরাইয়া ইয়াসমীন হীরা
অসীম কুমার সাহা
বাংলাদেশের আদিবাসী-উপজাতি বিতর্ক
মোঃ আজিজুল হক
কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার গান : লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন
সুরঞ্জন রায়
চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভূতভাগানো গান : পরিচয় ও প্রকৃতি
আবুল হাসান চৌধুরী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
চতুর্দশ সংখ্যা ১৪১৩

# ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আবুল বাসার মিঞা

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩
প্রকাশকাল : চৈত্র ১৪১৩, মার্চ ২০০৭

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

**প্রকাশক**

মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩ ।। ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

**কভার ডিজাইন**
আবু তাহের বাবু

**সম্পাদনা সহকারী**
এস.এম. গোলাম নবী
উপ-রেজিস্ট্রার, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**মুদ্রক**
মেসার্স উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

**মূল্য**
টাকা ১৫০.০০

## সম্পাদকমণ্ডলী


**নির্বাহী সম্পাদক**

**মোঃ আবুল বাসার মিঞা**
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**সহযোগী সম্পাদক**

**স্বরোচিষ সরকার**
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**সদস্য**

**মু. আবদুল কাদির ভূঁইয়া**
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রীতি কুমার মিত্র**
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**এম. জয়নুল আবেদীন**
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**আবু দাউদ হাসান**
প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**সনজীব কুমার সাহা**
প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**আনওয়ারুল হাসান সুফি**
প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**এম. জগলুল হায়দার**
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**বেগম আসমা সিদ্দিকা**
প্রফেসর, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**এম. মোস্তাফা কামাল**
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**মোহাম্মদ নাজিমুল হক**
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)


## যোগাযোগ


নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

## প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব কুড়ি হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি রি-রাইটেবল সিডিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে"। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে।

# সূচিপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম | ॥ | কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ : গঠনশৈলী ও স্থাপত্য উৎস | ০৭ |
| মো. ফজলুল হক | ॥ | উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) ও বাংলাদেশের অর্থনীতি | ১৭ |
| মোহাম্মদ নাজিমুল হক | ॥ | বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার স্বরূপ | ২৯ |
| অশোক বিশ্বাস | ॥ | বাঙালির দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনে দ্রাবিড় প্রভাব | ৩৯ |
| সুরাইয়া ইয়াসমীন হীরা<br>অসীম কুমার সাহা | ॥ | ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-৯০) | ৬১ |
| মোঃ আজিজুল হক | ॥ | বাংলাদেশের আদিবাসী-উপজাতি বিতর্ক | ৭৭ |
| সুরঞ্জন রায় | ॥ | কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার গান : লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন | ৯১ |
| আবুল হাসান চৌধুরী | ॥ | চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভূতভাগানো গান : পরিচয় ও প্রকৃতি | ১১১ |

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ : গঠনশৈলী ও স্থাপত্য উৎস

কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান*
এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম**

**Abstract:** The mosque of Qazi Sadaruddin is situated in the village of Shaharguchi under Ghoraghat P.S. in the district of Dinajpur. It is an oblong and three-domed structure.The building is now badly damaged. From the remains we can have an idea of its original forms. The *qiblah* wall still shows three *mihrabs*, the central one being traditionally larger than the flanking ones. Corresponding to these *mihrabs* there are three doorways in the eastern wall. There are two similar doorways on the north and south. The date and the builder of the mosque are not known from any inscription. But local legend relates that one Qazi of Sarkar Ghoraghat named Sadaruddin constructed the mosque. In this paper, an attempt has been made to throw light on the architectural origin of its different structural and ornamental features.

## ভূমিকা

কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানার অন্তর্গত শহরগুছি গ্রামে অবস্থিত। এটি থানা সদর থেকে ৩ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং বগুড়া-দিনাজপুর মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১.৫০ কি.মি. দূরে করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বর্তমানে মসজিদটির গম্বুজ ও উপরের নির্মাণ কার্য সমুদয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। পূর্বে এটি বন-জঙ্গলে আবৃত ছিল। কিছু দিন পূর্বে জনসাধারণ কর্তৃক স্থানটি জঙ্গলমুক্ত হওয়ায় এর ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী সম্পর্কে সাম্যক ধারণা পাওয়া যায়। জনদৃষ্টির আড়ালে অব্যবহৃত ও ধ্বংসাবস্থায় বিদ্যমান মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী পর্যালোচনার সাথে সাথে এটিকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করা এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। এতে করে প্রত্ন-পিপাসুদের স্থাপত্য-পিপাসা কিঞ্চিৎ হলেও পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। তবে বর্তমানে স্থানীয়ভাবে মসজিদটি সংস্কার করে গম্বুজের স্থলে টিনের ছাউনির আচ্ছাদন দিয়ে নিয়মিত নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে (আলোকচিত্র ১)।

## ভূমি নকশা ও গঠন (ভূমি নকশা ১)

আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের বহিঃপরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৫ মি. ও প্রস্থে ৫.৬০ মি.। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সম্মুখ দিকে কিছুটা উদ্‌গত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের এ উদ্‌গত অংশের উভয়

---

* ড. কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পার্শ্বে দুটি সরু ক্ষুদ্র বুরুজ (turret) সংযোজনের চিহ্ন অদ্যাবধি লক্ষ করা যায় (আলোকচিত্র ২)। প্রবেশপথগুলো আবার চতুঃকেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট ও আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত (আলোকচিত্র ৩)। সম্মুখ দিকের প্রবেশপথগুলোর ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে প্রবেশপথ বিদ্যমান। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালের খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাব অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির (আলোকচিত্র ৪ক) হলেও উভয় পার্শ্বের মিহরাব দুটি আয়তাকৃতির (আলোকচিত্র ৪খ)। মিহরাবসমূহের খিলানমুখ এক সময় খাঁজ নকশায় সজ্জিত ছিল বলে অনুমিত হয় (বর্তমানে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত)। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি কেন্দ্রীয় খিলানপথের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে কিছুটা উদ্‌গত এবং এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি সরু ক্ষুদ্র বুরুজ (turret) সংযোজনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

মসজিদের চার কোণায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ ছিল যেগুলোর ভিতের চিহ্ন (আলোকচিত্র ৫) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই এবং এ বুরুজগুলো একদা কার্নিশের উপরেও কিয়ৎদূরে উত্থিত হয়ে নিঃছিদ্র ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ এগুলোর ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে দালানের তলদেশে নিপতিত। এ ভগ্ন বুরুজগুলো আবার কলসাকৃতির ভিত্তিভূমি থেকে উত্থিত। একদা মসজিদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্গাত্র পলেস্তারার আস্তরণে আচ্ছাদিত ছিল যার চিহ্ন এখনও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায় (আলোকচিত্র ২)।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৩ মি. ও প্রস্থে ৩.৭০ মি.। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা বিভক্ত এক আইল বিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় 'বে'-টি কিছুটা বড়।[১] নামাজগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর একটি করে গম্বুজ সন্নিবেশিত ছিল। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা কিছুটা বড় ছিল যা মোগল বাংলার স্থাপত্যের একটি চিরাচরিত রীতি। গম্বুজগুলো মসজিদের প্রবেশপথসমূহ, মিহরাব এবং আড়াআড়ি খিলানের উপর সংস্থাপিত ছিল বলে অবস্থা দৃষ্টে অনুমিত হয়।

মসজিদের নামাজগৃহের সম্মুখে ১৫.২০ মি. × ১০.২০ মি.পরিমাপের প্রাচীর বেষ্টিত একটি খোলা চত্বর বা উন্মুক্ত অঙ্গন ছিল। এ চত্বরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রাচীরের চিহ্ন বর্তমানে দৃশ্যমান না হলেও এর পূর্ব দিকের প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে নামাজগৃহের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর একটি প্রবেশতোরণ ভগ্নাবস্থায় আজও দণ্ডায়মান (আলোকচিত্র ৬)। এ প্রবেশতোরণের অবস্থান থেকে নামাজগৃহের সম্মুখে উন্মুক্ত অঙ্গনের ধারণাটি সুস্পষ্ট। এ প্রবেশতোরণ সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি করে কক্ষের ধ্বংসাবশেষ আজও পরিলক্ষিত হয় এবং কক্ষ দুটি সম্ভবত ইমাম সাহেবের আবাসস্থল ও পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে অনুমিত হয়।

## নির্মাণকাল ও নির্মাতা

মসজিদটি কখন নির্মিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো শিলালিপি বা অন্য কোনো নির্ভুল তথ্য অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি সদরউদ্দীন নামক জনৈক কাজী বা বিচারক কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। সদরউদ্দীন ঘোড়াঘাট সরকারের একজন কাজী ছিলেন।[২] এর বিদ্যমান ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী পর্যালোচনা করলে মসজিদটির সম্ভাব্য নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ মসজিদের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (১) দুটি খিলান দ্বারা তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত নামাজগৃহটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিতকরণ;

---

[১] মসজিদের 'বে'গুলোর পরিমাপ যথাক্রমে ৩.৩৬ মি. × ৩.৬২ মি. × ৩.৩৬ মি.।

[২] আ.কা.ম. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা : শিল্পকলা একডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১১০।

(২) কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ (turret) সংযোজন; (৩) অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব এবং (৪) বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ। বাংলায় প্রাক-মোগল আমলে নির্মিত কোনো মসজিদে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর কোনোটি কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে এগুলো মোগল মসজিদ স্থাপত্যের কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অতএব মসজিদটি যে মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত নির্মাণ রীতির আবির্ভাব একই সময়ে ঘটেনি। উপরোক্ত রীতিগুলোর প্রথমটি ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদে[৩] এবং দ্বিতীয় নির্মাণশৈলীটি ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একই জেলার খোন্দকারতোলা মসজিদে লক্ষ করা যায়।[৪] আর তৃতীয় রীতির প্রয়োগ সর্বপ্রথম ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ ঈদগাহে পরিলক্ষিত হয়।[৫] সর্বোপরি শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় ১৬৩২-৩৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ঢাকার ইসলাম খান-কি-মসজিদে।[৬] এছাড়া উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদের (১৭৪১ খ্রি.) সাথেও যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।[৭] সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে।

**পর্যালোচনা**

সরকার ঘোড়াঘাট[৮] তথা বাংলার বিদ্যমান মসজিদসমূহের মধ্যে কাজী সদরউদ্দীন মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মোগল মসজিদের এক নতুন রূপ। এ মসজিদের কেন্দ্রীয় 'বে'-টি পার্শ্ববর্তী 'বে'-দুটি অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় 'বে'-এর ন্যায় কেন্দ্রীয় গম্বুজটিও পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ ছিল। মোগল বাংলার এ নির্মাণ রীতিটির আদি উৎস উত্তর ভারতে।[৯] উত্তর ভারতের ফতেপুর সিক্রি, দিল্লী, আগ্রা এমন কি লাহোরে নির্মিত মোগল আদর্শ নকশার মসজিদগুলোর অভ্যন্তরীণ বিন্যাস উক্ত রীতিতে সম্পাদিত। উদাহরণস্বরূপ ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আগ্রা জামি মসজিদ[১০] ও ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত লাহোরের বাদশাহী মসজিদের[১১] কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং একথা

---

[৩] এম. এ. বারী, "ঘোড়াঘাট দুর্গের প্রাচীন মসজিদ : আবিষ্কার, বর্ণনা ও তারিখ নির্ধারণ," *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫, পৃ. ৮৭। অবশ্য এ সম্পর্কে সি. বি. আশের বলেন, In the plan of the Kherua mosque, a type popular in the Delhi region since the fifteenth century and it is probably the earliest mosque of this type in Bengal, দ্রষ্টব্য, জি. মিচেল সম্পাদিত, *দি ইসলামিক হেরিটেজ অব বেঙ্গল* (প্যারিস: ইউনেস্কো, ১৯৮৪), পৃ. ১৩০।

[৪] জি. মিচেল সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১।

[৫] এ. এইচ. দানী, *মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬১), পৃ. ২০৫।

[৬] এম. এ. বারী, *মুঘল মস্কস্ টাইপস্ ইন বাংলাদেশ : অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, আই.বি.এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯), পৃ. ১৮১-৮৪।

[৭] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব* (অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), পৃ. ১০৮-১০।

[৮] মোগল আমলে প্রশাসনিক সুবিধার্থে সুবা বাংলাকে যে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করা হয় তন্মধ্যে সরকার ঘোড়াঘাট অন্যতম।

[৯] এম. এ. বারী, *মুঘল মস্কস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪।

[১০] পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার : ইসলামিক পিরিয়ড* (বোম্বে : তারাপুরভ্যালা সন্স এন্ড কো. লি., ১৯৭৫), প্লেট ৮৬, আলোকচিত্র ১।

[১১] *তদেব*, প্লেট ৯৩, আলোকচিত্র ১।

অনস্বীকার্য যে বাংলার বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ বিশিষ্ট মোগল মসজিদ উত্তর ভারতীয় মোগল মসজিদ স্থাপত্যেরই এক জনপ্রিয় অনুকরণ।

কাজী সদরউদ্দীন মসজিদের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো চতুঃকেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার। এ চতুঃকেন্দ্রিক খিলান নির্মাণ রীতির উৎসস্থল ছিল অনেক গভীরে। ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত রাক্কা শহরের বিদ্যমান বাগদাদ তোরণে চতুঃকেন্দ্রিক খিলান মুসলিম স্থাপত্যের সম্ভবত প্রথম উদাহরণ।[১২] পরবর্তীতে এ চতুঃকেন্দ্রিক খিলান পারস্যের সেলযুক স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সর্বজনীন উপাদানে পরিণত হয়।[১৩] ভারত উপমহাদেশে তুঘলক স্থাপত্যে সর্বপ্রথম চতুঃকেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সামাধিতে।[১৪] এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল দিল্লীর মোগল স্থাপত্যে। উদাহরণস্বরূপ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হুমায়ূনের সমাধি[১৫] ও ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আগ্রার ইতিমাদ-উদ-দৌলার সামাধির[১৬] কথা উল্লেখ করা যায়। সুতরাং এ ধরনের চতুঃকেন্দ্রিক খিলান ব্যবহারের সর্বজনীনতা বাংলার মোগল ইমারতসমূহে লক্ষ করা যায়। যেমন সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত গৌড়ের শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ ও সমাধি, ঢাকার লালবাগ মসজিদ ও পরী বিবির মাযার (সপ্তদশ শতাব্দী), হাজী খাজা শাহ্বাজ মসজিদ (১৬৭৯ খ্রি.), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৮০ খ্রি.), নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়মের মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দী), চট্টগ্রামের কদম মোবারক মসজিদ (১৭১৭ খ্রি.) প্রভৃতিসহ আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

এ মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত বড় এবং সম্মুখ দিকে কিছুটা উদ্গত। এ উদ্গত অংশের উভয় পার্শ্বে দুটি সরু ক্ষুদ্র বুরুজ (turret) সংযোজনের চিহ্ন অদ্যাবধি লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে সরু ক্ষুদ্র বুরুজ (turret) সংযোজনের রীতিটি বাংলার স্থাপত্যে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত মালদহ জামি মসজিদে প্রথম পরিদৃষ্ট হয়।[১৭] এ রীতিকে অনেকেই সেলযুক-পারস্য ও আনাতোলিয়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত বলে অনুমান করে থাকেন।[১৮] পরবর্তীকালে এ রীতি ভারতবর্ষে ব্যাপক অনুসৃত হয় যেমন ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত দিল্লীর বেগমপুরী ও খিড়কি মসজিদ এবং ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত জামালা মসজিদ ইত্যাদি।[১৯] পরবর্তীতে উত্তর ভারতের মোগল স্থাপত্যে এ রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ফতেপুর সিক্রি জামি মসজিদ ও ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আগ্রা জামি মসজিদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[২০] সুতরাং বলা যায় যে, বাংলার

---

[১২] এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য* (ঢাকা : শিল্পকলা একডেমী, ১৯৭৯), পৃ. ১৮৬।

[১৩] এ. ইউ. পোপ, *পারসিয়ান আর্কিটেকচার* (নিউইর্য়ক : জর্জ ব্রাজিলার, ১৯৬৫), পৃ. ১০৬ অতঃপর।

[১৪] গিয়াস উদ্দীন তুঘলকের সমাধির খিলান ছিল চতুর্কেন্দ্রিক ও টিউডোর খিলানের আকৃতি সম্পন্ন, দ্রষ্টব্য, এম. মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী : প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ১২৩।

[১৫] পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, প্লেট ৬২, আলোকচিত্র ১।

[১৬] *তদেব*, প্লেট ৮০, আলোকচিত্র ১।

[১৭] জি. মিচেল সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬-০৭।

[১৮] জে. ডি. হেগ, *ইসলামিক আর্কিটেকচার* (নিউইর্য়ক, ১৯৭৭), পৃ. ২৮৮।

[১৯]জি. মিচেল সম্পাদিত, *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড* (লন্ডন : থামস এন্ড হাডসন, ২০০০), পৃ. ২৬৮; এস. গ্রোভার, *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া : ইসলামিক (৭১২-১৭০৭)* (দিল্লী : বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রা. লি., ১৯৮৯), পৃ. ৪২, আলোকচিত্র ২.১৭; পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, প্লেট ১৮, আলোকচিত্র ১।

[২০] এ. বি. এম. হোসেন, *ফতেপুর সিক্রি এন্ড ইটস আর্কিটেকচার* (ঢাকা : ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন, ১৯৭০), পৃ. ১০৩, আলোকচিত্র ৩৫; পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, প্লেট ৮৬, আলোকচিত্র ১।

মসজিদ স্থাপত্যের এ বৈশিষ্ট্যটি উত্তর ভারতের মোগল স্থাপত্যের এক জনপ্রিয় অনুকরণ[২১] এবং বর্তমান মসজিদটি এর অন্যতম উদাহরণ।

আলোচ্য মসজিদের বহির্ভাগের চার কোণায় অষ্টভুজাকৃতির বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় এবং বুরুজগুলো ছাদের উপরিভাগ পর্যন্ত উত্থিত হয়ে নিশ্ছিদ্র ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত ছিল বলে অনুমিত হয় যা মোগল বাংলার স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উসমানীয় তুর্কি স্থাপত্যে সুউচ্চ মিনার আকৃতির কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ইল্‌দ্রিনের ইউসি সেরিফলি মসজিদ (Uc Serefeli Cami) ও সেলিমিয়া মসজিদের (Selimiye Cami) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[২২] লক্ষণীয় বিষয় হলো তুর্কি স্থাপত্যের মিনার আকৃতির কোণস্থিত বুরুজগুলোর শীর্ষভাগ ছুঁচালো পেন্সিল আকৃতির অথচ ভারত উপমাহাদেশের মোগল ইমারতসমূহে ব্যবহৃত কোণস্থিত বুরুজসমূহ সুউচ্চ ভাবে নির্মিত হলেও ছুঁচালো পেন্সিল আকৃতির নয় বরং এগুলোর শীর্ষভাগ ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত এবং শীর্ষ বিন্দু শীর্ষদণ্ডে শোভিত।

বাংলার মসজিদসমূহ সাধারণত দু ধরনের পরিকল্পনায় নির্মিত যথা (ক) প্রাচীর ঘেরা উন্মুক্ত চত্বর বিশিষ্ট[২৩] এবং (খ) উন্মুক্ত চত্বর বিহীন গম্বুজ আবৃত মসজিদ। আলোচ্য মসজিদটি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ উন্মুক্ত অঙ্গনের প্রাচীরের সাথে কোনো বারান্দা নির্মিত হয়নি। বলা বাহুল্য বারান্দা বিহীন প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত অঙ্গনের ব্যবহার বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে কোনো নতুন উদাহরণ নয় বরং এ রীতির উৎসস্থল ভারতে যার উদাহরণ হলো ১২১১-৩৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত নাগাউরের শামস মসজিদ।[২৪] বারান্দা বিহীন প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত অঙ্গন সম্বলিত এ মসজিদটি স্পেনে প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক ৭৮৫-৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত কর্দোভা জামি মসজিদ এবং ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদাতয়াল্লাহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত কায়রাওয়ান মসজিদের কথাই স্বরণ করে দেয়।[২৫]

অলংকরণ বিষয়বস্তু হিসেবে খিলানে খাঁজ নকশার ব্যবহার বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ খাঁজ নকশা সুলতানী বাংলার ইমারতসমূহে যেমন গৌড়ের ছোটসোনা মসজিদের প্রবেশপথে, রাজশাহীর বাঘা মসজিদের মিহরাবে, নওগাঁ জেলার কুসুম্বা মসজিদের মিহরাব ও প্রবেশপথে পরিদৃষ্ট হয়।[২৬] অনুরূপভাবে মোগল আমলেও ইমারতের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য খাঁজ নকশার ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন ঢাকার খাজা শাহবাজ মসজিদের অভ্যন্তরীণ খিলানে, সাতগম্বুজ মসজিদের প্রবেশপথে, এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদের মিহরাবে খাঁজ নকশার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[২৭] আলোচ্য মসজিদে খাঁজ নকশার ব্যবহার তারই ধারাবাহিকতা বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে খাঁজ নকশার ব্যবহার নতুন কোনো উদাহরণ নয়। বরং বাংলার মুসলিম

---

[২১] In imitation of the Persian Iwan the practice of giving was attempted right from the beginning of the Muslim rule in the subcontinent and it was perfected, after a long way journey, in the Mughal period, দ্রষ্টব্য, এম. এ. বারী, *মুঘল মস্কস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[২২] জি. গুডউইন, *এ হিস্ট্রি অব অটোমান আর্কিটেকচার* (লন্ডন : থামস্ এন্ড হাডসন, ১৯৭১), পৃ. ১০১, প্লেট ৯৬ ও ৩।

[২৩] The Bengal mosque is a compact building, having only the prayer chamber, with an open grassy courtyard in front and a large tank on one side, দ্রষ্টব্য, এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২।

[২৪] এম. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১।

[২৫] *তদেব*, পৃ. ১১২।

[২৬] এ. এইচ. দানী, পূর্বোক্ত, প্লেট ৩৮, ৪৫, ৫২ ও ৫৩।

[২৭] *তদেব*, প্লেট ৬৫,৬৬ ও ৭৯।

স্থাপত্যে ব্যবহৃত খাঁজ নকশা বৌদ্ধ স্থাপত্যের ত্রি-খাঁজ নকশা থেকে উদ্ভূত বলে অনুমান করা হয়।[২৮] আবার ধারণা করা হয় যে, রোমান স্থাপত্যের শঙ্খ খোসা অলঙ্করণের শিরালো খাঁজ নকশা থেকে এর উৎপত্তি।[২৯] শঙ্খ খোসার শিরালো খাঁজ নকশা থেকে নীত হয়েছে পারস্যের সাসানীয় আমলের *তাক-ই-কিসরা* প্রাসাদের প্রধান ফটকের খিলানের সম্মুখস্থ খাঁজ সারি।[৩০] এ খাঁজ নকশা উত্তর আফ্রিকার কায়রওয়ান মসজিদ থেকে আরম্ভ করে ফাতেমীয় আমলের অনেক ইমারতেই পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এ খাঁজ নকশা আজমীরের *আড়াই দিনকা ঝোপড়া* মসজিদের খিলান পর্দার কেন্দ্রীয় খিলানে লক্ষ করা যায়।[৩১] পরবর্তীকালে এ খাঁজ নকশা মোগল স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে যার উদাহরণ হলো দিল্লীর *দিওয়ান-ই-আম* ও রংমহল।[৩২] খাঁজ নকশা মোগল আমলের পরেও ভারত উপমাহাদেশে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। সম্ভবত এটি একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক অলঙ্করণ যা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দির স্থাপত্যেও অনুপ্রবেশ করেছিল। এ প্রসঙ্গে পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন শিবমন্দির (১৮২৩-১৮৩০ খ্রি.)[৩৩], পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দির (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে)[৩৪] ও দিনাজপুরের কান্তজীর নবরত্ন মন্দিরের (১৭৫২ খ্রি.)[৩৫] কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ বাংলার মোগল আমলে নির্মিত স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। মসজিদটি অব্যবহৃত ও ভগ্নাবস্থায় জঙ্গলে আবৃত থাকায় তা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে পূর্ণাঙ্গ কোনো প্রত্নস্থল বা প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধান পরিচালিত হয়নি। অথচ এ ধরনের অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলে এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বহু অজানা প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হতে পারে যা আমাদের দেশের স্থাপত্যকলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। গত কয়েক বছর ধরে (২০০০ সালের পর থেকে) আলোচিত মসজিদটির উপরে টিনের আচ্ছাদন দিয়ে স্থানীয় জনগণ প্রতিদিন নামাজ আদায় করে আসছে। অথচ এ প্রাচীন মসজিদটির প্রতি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন।

---

[২৮] এম. আর. তরফদার, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অলংকরণ প্রসঙ্গ", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ১ম-২য় সংখ্যা, ঢাকা, বাং ১৩৯৪, পৃ. ৮৫।

[২৯] এ. বি. এম. হোসেন, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় স্থাপত্যিক অলংকরণ", *এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বাং ১৩৯৭), পৃ. ২৫৫।

[৩০] *তদেব*।

[৩১] এম. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭, আলোকচিত্র ৭।

[৩২] পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, প্লেট ৮৯, চিত্র নং ২ ও প্লেট ৮২।

[৩৩] কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন শিবমন্দির", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ. ১৪২।

[৩৪] কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী", *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, পার্ট এ, ভলিয়্যম ৩২, ২০০৪, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

[৩৫] *তদেব*, পৃ. ২২৯।

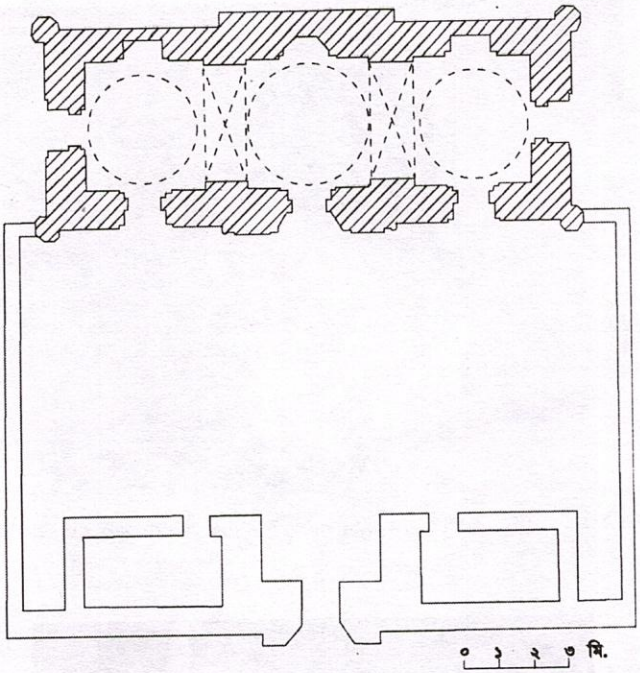


ভূমি নকশা ১ : কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ (ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর)

আলোকচিত্র ১ : কাজী সদরউদ্দীন মসজিদের সাধারণ দৃশ্য (বর্তমানে টিনের ছাউনিযুক্ত)

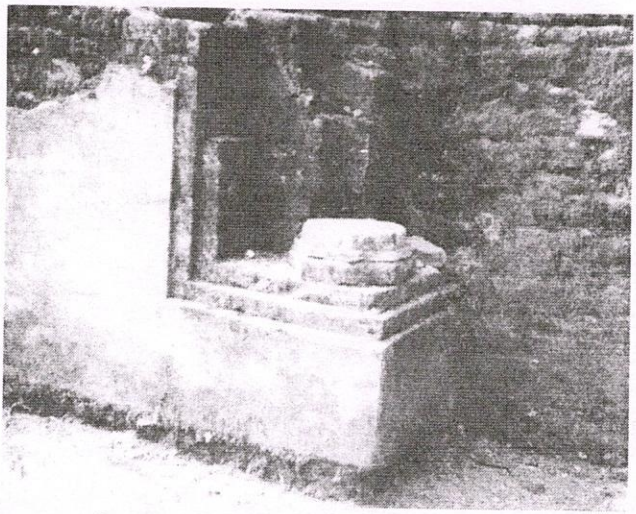

আলোকচিত্র ২ : কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয়পার্শ্বে সংযোজিত সরু ক্ষুদ্র বুরুজের ভিতের চিহ্ন

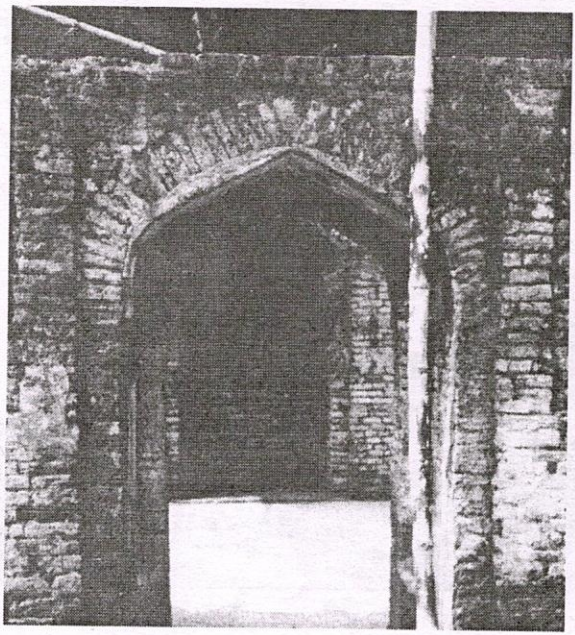

আলোকচিত্র ৩ : চতুর্কেন্দ্রিক খিলান (মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রবেশপথ)

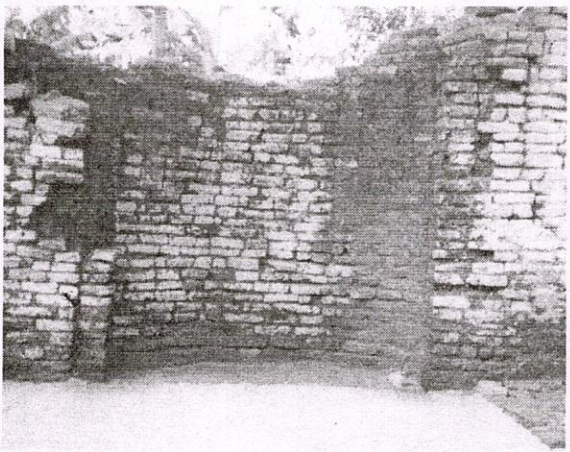

আলোকচিত্র ৪ক : অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির কেন্দ্রীয় মিহরাব

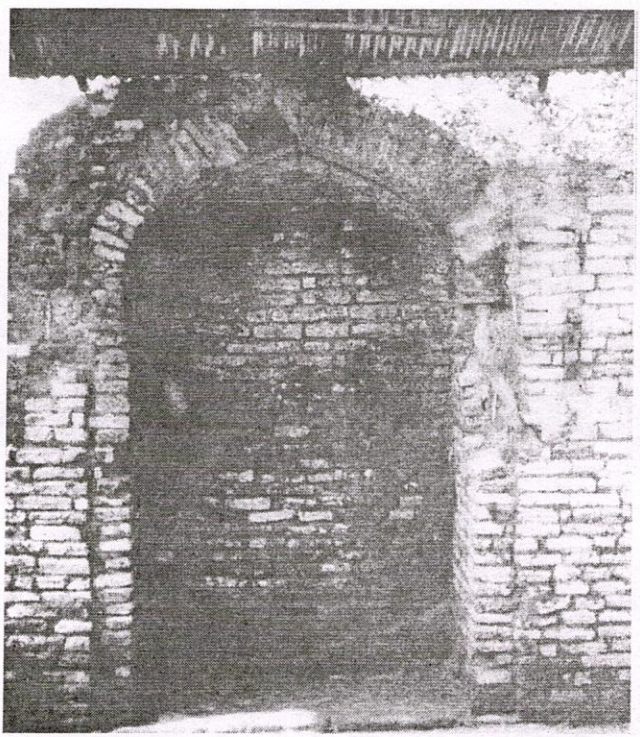

আলোকচিত্র ৪খ : আয়তাকৃতির মিহরাব (দক্ষিণ পার্শ্বের)

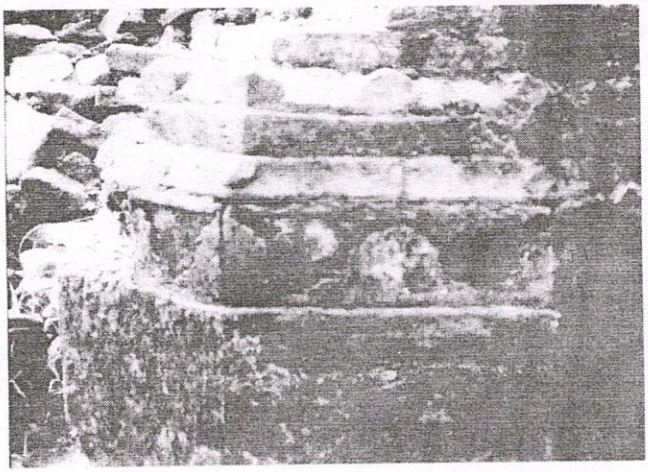

আলোকচিত্র ৫ : কোণাস্থিত অষ্টভুজাকৃতির বুরুজের ভিত্তিমূল।

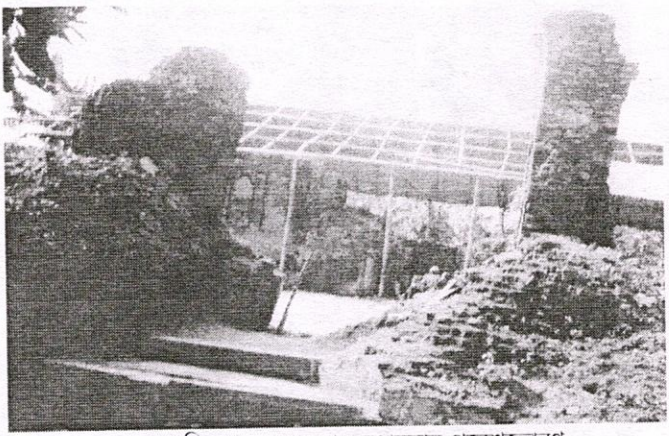

আলোকচিত্র ৬ : ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান প্রবেশতোরণ

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) ও বাংলাদেশের অর্থনীতি

মোঃ ফজলুল হক*

**Abstract:** Gulf War in 1990 and its economic impact in Bangladesh is welknown to the Bangladeshi people. Many skilled and unskilled labourers worked in the Middle East and they used to send foreign currency to Bangladesh regularly. Bangladesh exported tea, vegitables and other things in Middle East and imported oil from there. During the Gulf War in 1990, all the Bangladeshi workers, who worked in Iraq and Kuwait, became jobless and returned home. Bangladesh had to stop import and export. In this article the author tried to explain the economic impact of Bangladesh due to the Gulf War in 1990.

## ভূমিকা

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা লাভের পর আরব দেশগুলোর মধ্যে ইরাক প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ইরাকের সাথে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কারণ ভারতের সাথে বরাবরই ইরাকের সম্পর্ক ভালো ছিল। যেহেতু ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সহযোগিতা প্রদান করে, সে কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে ইরাক স্বীকৃতি প্রদান করে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রদান করে। ইরাক ছিল মার্কিন বিরোধী। কাজেই ইরাকের সমর্থন পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং বাংলাদেশের সপক্ষে হওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়ে উভয় দেশের সাথে বাংলাদেশ ভারসাম্যমূলক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে ইরাক-ইরান যুদ্ধে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেও ইরাকের দিকেই বাংলাদেশের একটু বেশি সহানুভূতি ছিল। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত এ কারণেই ইরাক বাংলাদেশের সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে, যা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত। বাংলাদেশের যে কোনো প্রকার দুর্যোগে ইরাক সব সময়েই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের দক্ষ-অদক্ষ জনশক্তিকে ইরাক সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ইরাকের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। কিন্তু ২রা আগস্ট ১৯৯০ ইরাক প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত দখল করলে বাংলাদেশ ইরাকের সাথে কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। কারণ বাংলাদেশের সরকারি সমর্থন ছিল স্বাধীন সার্বভৌম কুয়েতের প্রতি।

* ড. মোঃ ফজলুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে পূর্ণ স্বীকৃতি দানকারী রাষ্ট্র কুয়েতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের যাত্রালগ্ন থেকেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কুয়েত সরকার সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ১৯৮২-১৯৯০ সালের মধ্যে কুয়েত থেকে বাংলাদেশে যে বেসরকারি আর্থিক সাহায্য এসেছে, এর পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকারও বেশি।[১] যার ফলে দুই দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। জনসাধারণের প্রতি ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশ বিমানবহরকে সম্প্রসারিত করার জন্য কুয়েত সরকার একটি বোয়িং ৭০৭ বিমান উপহার দেয়। তাছাড়া বাংলাদেশের পল্লী বিদ্যুতায়নে সাহায্য প্রদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল নির্মাণ—বাংলাদেশের প্রতি কুয়েতের বন্ধুত্বেরই প্রমাণ। যে সব সংস্থার মাধ্যমে কুয়েত সরকার এ সব সাহায্য প্রদান করেন, তার মধ্যে কুয়েত যাকাত হাউস, কুয়েত গণকমিটি, কুয়েতের পারস্পরিক ত্রাণকমিটি, আন্তর্জাতিক ইসলামি দাতব্য ফাউন্ডেশন, ইসলামি ঐতিহ্য পুনরুত্থান সংস্থা, কুয়েত মেডিকেল সেন্টার, ওয়াক্ফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রাণালয় অন্যতম। স্বাধীনতা উত্তর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-কুয়েত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। ২রা আগস্ট ১৯৯০ ইরাক প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত দখল করলে বাংলাদেশের সরকারি সমর্থন কুয়েতের পক্ষে অব্যাহত থাকে। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত।

### উপসাগরীয় যুদ্ধে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি

উপসাগরীয় সংকটের সূচনাই ছিল বাংলাদেশের জন্য এক চরম দুঃসংবাদ। বাংলাদেশের প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার নাগরিক ইরাক এবং কুয়েত আটকা পড়ে। এদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং পুনর্বাসন বাবদ যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়, তার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের অশনি সংকেত লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি উপসাগরীয় সংকট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতি প্রবাহের উপরই শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, এদেশের রাজনীতিতেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সকল রাজনৈতিক কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলো উপসাগরীয় সংকট নিয়ে যত সংবাদ, ফিচার, প্রবন্ধ, উপসম্পাদকীয় এবং সম্পাদকীয় লিখেছে, ইরাক এবং কুয়েত থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো এ রকম ভিন্নধর্মী লেখা-লেখি করেছে কিনা সন্দেহ। অপরদিকে বন্ধুপ্রতিম আরব দেশগুলোর দ্বিধা-বিভক্তির ফলে উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হবে এ 'রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রশ্নে' এক নতুন সংকট সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায় উপসাগরীয় সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি কূটনৈতিক সমস্যা বয়ে আনে। ইরাক-কুয়েত দুটি মুসলিম দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সংবেদনশীল। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে আন্তর্জাতিক সমস্যায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী কুয়েতের প্রতি কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করে এবং ইরাকের আগ্রাসনের নিন্দা জ্ঞাপন করে। কারণ কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যায় বাংলাদেশের জাতিসংঘ সনদের প্রতি আনুগত্য থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া বাংলাদেশের সাহায্যদাতা দেশগুলো তথা দুই পরাশক্তি স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অংশীদার সকল দেশ ইরাকের আগ্রাসনের নিন্দা করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এদিকে থেকেও বিবেচনা করে বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে করে। তবে বিশ্ব জনমতের নিরিখে ইরাকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ অবস্থান হতে পারতো নিয়ম মাফিক প্রতিবাদ ও নিঃস্পৃহ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে। কিন্তু এই

---

[১] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১২ই আগস্ট, ১৯৯০, পৃ. ৩।

গতানুগতিক ভূমিকা বাংলাদেশের জন্য কতটুকু সময়োপযোগী হতো সে বিষয়েও কূটনৈতিক মহল যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বাংলাদেশ সরকার ইরাকি আগ্রাসনের নিন্দা, কুয়েত হতে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহার এবং আস-সাবা পরিবারের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন কামনা করে বিবৃতি প্রদান করে । এর মাত্র কয়েকদিন পর সৌদি বাদশা ফাহদের বিষেশ দূত সৌদি আরবকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জানান। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এইচ. এম. এরশাদ ঘোষণা করেন যে, বাদশা ফাহদের আহবানে সাড়া দিয়ে সৌদি আরব রক্ষাকারী আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বাংলাদেশ প্রতীকী সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে।[২] বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের এ স্পষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রাথমিক অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কিছু মহল থেকে। তবে বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের এই প্রথম সঠিক বা ভুল যাই হউক না কেন একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত কূটনীতির ক্ষেত্রে গুণগত উত্তরণের এক নতুন মাত্রার সূচনা করে।

উপসাগরীয় সংকটে এরশাদ সরকারের এ সিদ্ধান্ত দেশে ও বিদেশে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে নতুন পরীক্ষার মাঝে ফেলে দেয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্ট এরশাদের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। নতুন আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ইরাক বাংলাদেশকে তার বৈরী বলয়ে আবিষ্কার করে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য সংকটজনিত প্রতিকূলতায় এরশাদ সরকারের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাবাসন ও অর্থনৈতিক চাপ সামলানো। মধ্যপ্রাচ্যে অবরুদ্ধ ১ লক্ষ ২০ হাজার নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদান ও দেশে ফিরিয়ে আনার এক অভূতপূর্ব সমস্যায় পড়তে হয় সরকারকে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ সরবরাহ বন্ধ, তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও মধ্যপ্রাচের রফতানি হ্রাসের বিষয়গুলো দরিদ্রতম বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রবল হুমকি হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এ মহাসংকটকালীন সময়ে সরকার সমস্যার মূল স্রোত থেকে একের পর এক ভূমিকা পালন করতে থাকে। অপরদিকে সকল বিরোধী দলগুলোর রাজনীতি গুটিয়ে পড়ে নিছক প্রতিবাদের মধ্যে। জাতির সংকটকালীন অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো জড় অবস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার হ্রাস বৃদ্ধির প্রেক্ষিত নির্মাণ করে। যদিও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে দেশের উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় সাহসী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দল মত নির্বিশেষে অনুকূল ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক মধ্যস্থতা রক্ষায় ব্যর্থ হবার ফলে বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র বিবৃতি প্রদানের ভূমিকাতেই নিজেদের আটকে রাখে।

ইরাক কর্তৃক দখলকৃত কুয়েতকে মুক্ত করা এবং সৌদি আরবে সম্ভাব্য ইরাকি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গঠিত আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীতে বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরাসরি সৌদি আরবের পক্ষাবলম্বন করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ অতীতের ন্যায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালনের গ্রহণযোগ্যতা হারায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রায়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ইসলামি সম্মেলন সংস্থার বিশেষ শান্তি মিশনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে ইরাক-ইরান ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু ইরাক-কুয়েত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য নীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, যে কারণে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সমঝোতার ফলাফল সর্ম্পকে যথেষ্ট আশাবাদী হওয়ার সুযোগ ছিল না; যদিও প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে পরামর্শ করে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের

---

[২] *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ১০-১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১৬।

কূটনীতি সফল করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ২৮শে আগস্ট ১৯৯০ সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান এবং সৌদি আরব সফর করেন। ২৯শে আগস্ট সৌদি বাদশা ফাহদ বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা সফল করার জন্য একটি সৌদি রাজকীয় বিমান ব্যবহারের সুযোগ দেন। ৩০শে আগস্ট সৌদি বিমান যোগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা আসেন এবং প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে তাঁর বার্তা নিয়ে দক্ষিণ এশীয় নেতৃবর্গের সাথে আলোচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩]

এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ তুরস্ক ও সৌদি আরব সফর করেন। তিনি বাদশাহ ফাহদের সঙ্গে উপসাগরীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে আল-মুশরিক প্রাসাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ খোলাখুলি ভাবে বলেন, 'কুয়েতে বৈধ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে এবং ইরাককে কুয়েত ছেড়ে যেতে রাজি করাতে একটি শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে এ ৬টি দেশে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, মালদ্বীপ এবং পাকিস্তান। তিনি আশ্বাস দেন ৬ দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে এবং শীঘ্রই এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছা যাবে। তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে এ সব এশীয় মুসলিম দেশে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য পাঠিয়েছেন।'[৪]

বাংলাদেশের এ শান্তি পরিকল্পনা মুসলিম বিশ্বে ইতিমধ্যেই "প্যান ইসলামিক" পরিকল্পনা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ইরাকের সম্পর্ক একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাগদাদ এবং ঢাকার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে ইরাক বাংলাদেশের কূটনীতিবিদদের বহির্গমনের অনুমতি দিতে রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষক মহল মন্তব্য করেন, এ শান্তি উদ্যোগের লাভ-ক্ষতি আছে কিনা তা ভাবতে হবে। কারণ কূটনৈতিক তৎপরতায় গায়ের জোরের সুযোগ নেই। শান্তি উদ্যোগের অন্যতম বিষয় হলো কুয়েত থেকে সরে আসতে ইরাককে রাজি করানো। বাংলাদেশের এ উদ্যোগ কার্যকর করতে হলে ৬টি এশীয় মুসলিম দেশের একমত হবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কূটনৈতিক উদ্যোগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেও এটা কার্যকর সহজ হবে না। পর্যবেক্ষক মহল আরো ধারণা করেন যে, বাংলাদেশ সংকটের শুরু থেকে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিলে তা ফলপ্রসূ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার ব্যাপারে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল না। উপরন্তু, বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণের ফলে বাগদাদের কাছে ঢাকার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।[৫]

এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১লা অক্টোবর ১৯৯০ নিউইয়র্কের ওয়ালড্রু টাওয়ার হোটেলের স্যুটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সাথে ৪০ মিনিট স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। দুই নেতার আলোচনার মূল বিষয় ছিল উপসাগরীয় সংকট। এ ব্যাপারে নীতিগত ভূমিকা গ্রহণের জন্য এবং বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণে জর্জ বুশ বাংলাদেশের প্রশংসা করেন।[৬] বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইরাকের কুয়েত দখলের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত ভূমিকার প্রতি বাংলাদেশের সংহতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা এই প্রথম বারের মতো শান্তি ও

---

[৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০শে আগস্ট, ১৯৯০, পৃ. ১।
[৪] *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ২১শে সেপ্টম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১৭-১৮।
[৫] *তদেব*, পৃ. ১৯।
[৬] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১২ ই অক্টোবর, ১৯৯০, পৃ. ১৩।

স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছে বলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জর্জ বুশকে ধন্যবাদ জানান।

উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশ ও বিদেশে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে নতুন পরীক্ষার মাঝে ফেলে দেয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সৌদি আরবকে সহায়তা করতে রাজি, যে কারণে সৌদি আরবের অনুরোধে বাংলাদেশ সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া জাতিসংঘ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, বাংলাদেশ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। বাংলাদেশি সৈন্য কেবলমাত্র প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো হবে বলে প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়।[৭]

বাংলাদেশ সরকারের জন্য দায়িত্বশীলতার ব্যাপকতর ক্ষেত্রটি ছিল নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিজ দেশের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান নির্ধারণ। মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মধ্য দিয়ে নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অর্থনৈতিক দিকগুলোই সবচেয়ে জোরালো বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত রাখতেই মূলত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে পর্যন্ত ইরাকের সামরিক প্রভুর ভূমিকা থেকে সরে এসে বিরোধী ভূমিকা নিতে হয়েছে। তাছাড়া এক সময়ের কমিউনিস্ট ব্লকের দেশগুলোও এই সংকটে ইরাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পরিহার করে। ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ পালন করতে গিয়ে ইউরোপীয় গোষ্ঠী, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইরাক বিরোধী আরবদেশগুলো নতুন অর্থনৈতিক মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত একটি দেশের জন্য মধ্যপ্রাচ্য সংকটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই নতুন মৈত্রী ব্যবস্থার। আর এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় ইরাক বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তি সমাবেশে বাংলাদেশ অংশ নেবে কিনা ? এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ইরাক বিরোধী কূটনীতি গ্রহণ করে। তবে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গতিশীলতা সব সময়ই কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ থাকে এবং গতিশীলতার মধ্যে অবস্থান উত্তরণের সুযোগও নিহিত থাকে। সৌদি আরবে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাংলাদেশ সরকারের প্রথম কাজ ছিল ইরাক ও কুয়েতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা ও পূর্ব সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক এবং অর্থপূর্ণ প্রমাণিত করা। বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ইইসি, আইওএম ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা। উক্ত সংস্থাগুলোর সহয়োগিতার ফলে ২৮৮টি ফ্লাইটের মাধ্যমে প্রায় ৮০ হাজার বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।[৮]

বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে বাংলাদেশিদের সীমান্ত অতিক্রমের জটিলতা নিরসন করেন, এমনকি মধ্যপ্রাচ্য সংকটজনিত কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনার্থে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। কেননা দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ শক্তি হিসেবে নতুন পরিচয় লাভ করে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদায় বরণীয় হয়েছে। এ জন্য আশা করা হয় বাংলাদেশের নতুন ভূমিকা বিশ্বের শক্তিগুলোকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাছাড়া কুয়েত আগ্রাসন মুক্ত হলে মিত্র দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাধান্য পাবে, এমন সম্ভাবনাও লক্ষ করা যায়।

---

[৭] *The Daily Observer*, 12 October, 1990.
[৮] Ibid.

মধ্যপ্রাচ্যের অনিশ্চিত পরিস্থিতির কবলে আটকে পড়ে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের নাগরিকের সাথে লক্ষাধিক বাংলাদেশি। এরা কর্মসংস্থানে ব্যস্ত ছিল কুয়েত ও ইরাকে। সর্বস্ব হারিয়ে এসব বাংলাদেশিরা স্বদেশে ফিরে আসার জন্য আটকা পড়ে তুরস্ক, সৌদি আরব ও জর্ডান সীমান্তে। মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর খোলা আকাশের নীচে অনাহারে, অর্ধাহারে, মশার কামড়ে কালাতিপাত করতে থাকে, অনেকে মারা যায় সাপের কামড়ে। জীবন মৃত্যুর মাঝামাঝি সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলতে থাকে তাদের জীবন। একই সঙ্গে এসব প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বজনরাও উদ্বেগাকুল বিনিদ্র রজনী যাপন করতে থাকে।

প্রবাসী বাাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সন্ধান করতে না পারায় বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা কামনা করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস, জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন দাতা দেশের নিকট। বাংলাদেশ সরকার ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ থেকে বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে শুরু করে। ঐদিন হতেই মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক-জর্ডান ও ইরাক-তুরস্ক সীমান্ত থেকে আটকে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাবাসন ব্যাপকহারে শুরু হয়। প্রত্যাবাসনে নিয়োজিত ফ্লাইটের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার ইতিমধ্যে প্রত্যাবাসনের সঙ্গে সঙ্গে আটকে পড়া এশীয় ক্যাম্পসমূহে খাদ্য ও ঔষধ সাহায্য প্রেরণ করে।[৯] ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত ইরাক ও কুয়েত থেকে প্রায় দশ সহস্রাধিক বাংলাদেশি দেশে ফিরে আসে। ১৮৬টি বিশেষ ফ্লাইটে ইরাক-কুয়েত আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হয়। আনুমানিক ১ লক্ষ ২০ হাজার বাংলাদেশি কর্মরত ছিল ইরাক ও কুয়েতে। এই হিসাব অনুযায়ী অধিকাংশ বাংলাদেশিই স্বদেশ ফেরার সঠিক সংবাদ না পেয়ে বাংলাদেশ সরকার ফ্লাইটের সংখ্যা আরো বাড়াতে থাকে এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সকল বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের ন্যায় সর্বগ্রাসী সংকট বাংলাদেশ সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য একটি ইস্যু এনে দেয়। সরকারের তৎপরতা দ্রুত শুরু হয় কিন্তু বিরোধী দলসমূহ যেমন আওয়ামী লীগ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তবে অনেক দলই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানায়। বাংলাদেশকে উপসাগরীয় সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে কোনো পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও মধ্যপ্রাচ্য সংকট বিরোধী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারেই গতানুগতিক।

### বাংলাদেশের সমাজ জীবনে উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রভাব

বাংলাদেশের সমাজ জীবনেও উপসাগরীয় সংকটের প্রভাব বিদ্যমান। প্রিয়জনদের মুখ দেখার জন্য জিয়া আন্তজাতিক বিমান বন্দরে ভিড় জমায় অসংখ্য মানুষ। মধ্যপ্রাচ্য হতে ফিরে আসা প্রবাসীদের করুণ কাহিনী শুনে অনেক মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বিমান বন্দরে স্বজনদের সন্ধান না পেয়ে ব্যথায় কেঁদেছে অনেক মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র অনেকেই। জীবনের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মের সংস্থান হলেও এ সংকটের ফলে ফিরে আসে নিস্ব হয়ে। বাংলাদেশ সরকার কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারায় এদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণ মিলে বাংলাদেশে বেকারত্বের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটির মতো। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইরাক এবং কুয়েতে বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা ছিল প্রায়

---

[৯] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ২৫।

এক লক্ষ সত্তর হাজার। কিন্তু উপসাগরীয় সংকটের কারণে তারা বাধ্য হয়েছে বাংলাদেশে ফিরে আসে। যে কারণে বাংলাদেশে বেকারত্বের সংখ্যা আরো বহু গুণে বেড়ে যায়। তাছাড়া ইরাক ও কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশিদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকেও বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়। তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে বাস ভাড়া বৃদ্ধি পায়। এতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ফলে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে নেমে আসে মহাদুর্যোগ। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মাঝে স্থবির পরিবেশ বিরাজ করে এবং উপসাগরীয় সংকট বিরোধী ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

প্রথম দিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে যে কোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জোরপূর্বক দখল করা আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন।[১০] বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য-ফেরত বাংলাদেশিদের ফিরে আসার করুণ কাহিনী শুনে এবং দেশে ফেরার পর তাদের সমস্যা দেখে জনমনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়। ইরাক-কুয়েত ফেরত প্রবাসী ফোরাম সংগঠনের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করলেও সরকারি পক্ষ কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। উপসাগরীয় সংকটের কারণে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বিশেষ করে কর্মসংস্থানের অভাব মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করে।

উপসাগরীয় সংকট সারা বিশ্বকে নাড়া দেয়। এ সংকটকে ঘিরে বাংলাদেশের উৎপাদন ও পণ্য বাজারে দেখা দেয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন ও শ্রীলংকা।[১১] এছাড়া আর একটি রিপোর্টে বলা হয়, মুসলিম-বিশ্বই এ সংকটের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিগত কয়েক শতাব্দীর উপনিবেশিক নাগপাশের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করে মুসলিম দেশসমূহ যখন নিজেদেরকে একটু গুছিয়ে নিতে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে তাদের ওপর চেপে বসে অস্তিত্ব বিপন্নকারী এ সংকট। এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে বাংলাদেশের ইসলামি চিন্তাবিদগণ।[১২]

**বেসরকারি চিন্তাধারা**

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের সমস্যা আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বেকারত্বের চাপে বাংলাদেশ এমনিতেই সমস্যাগ্রস্ত, তার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ফেরত বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে বেকারত্বের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লক্ষাধিক লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।[১৩]

ইরাকের কুয়েত দখল এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী কুয়েত ফেরত নুরুল ইসলামের চোখে এক বিভীষিকাপূর্ণ অধ্যায়। ঢাকার সূএাপুরের কাগজী টোলায় তার বাসা। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সাপ্তাহিক বিচিত্রা অফিসে এসে তিনি দেশে ফেরার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কুয়েতের ন্যাশনাল ফিড কনসেনট্রিডস কোম্পানিতে মার্কেটিং অফিসার হিসেবে ১৯৮৫ সাল থেকে কর্মরত ছিলেন। বেতন মাসিক ১৬০ দিনার, বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার টাকা।[১৪] কোম্পানির নিকট বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, ব্যাংকে নগদ টাকা এবং বাসায় হাজার হাজার টাকার সম্পদ ফেলে রেখে শুধু জীবন নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছেন।[১৫] কুয়েত থেকে বাংলাদেশে ফেরার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের পাসপোর্ট স্ব স্ব ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর

---

[১০] তদেব।
[১১] *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ঢাকা,২৬শে সেপ্টম্বর, ১৯৯০, পৃ. ১৩।
[১২] তদেব।
[১৩] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ২৮।
[১৪] তদেব, পৃ. ৩১।
[১৫] তদেব।

করে নিজ নিজ নিরাপত্তার ভার নিজেদের গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে গা ঢাকা দেয়। এমতাবস্থায় তিনি বড় একটা খোলা লরিতে করে ৮৬ জন বাংলাদেশি দলের সাথে ২৬শে আগস্ট ১৯৯০ বিকেল ৫টায় কুয়েত ত্যাগ করেন।[১৬]

এমন ধরনের হাজার হাজার বাংলাদেশি কুয়েত ও ইরাক থেকে নিস্ব হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের টাকা আটকা পড়েছে কুয়েতের ব্যাংকে এবং সম্পদ লুট করে নিয়েছেন ইরাকি সৈন্যরা। দেশে ফিরে আহাজারি করা ছাড়া এখন তাদের আর কিছুই করার নেই। তাদের সামনে একটিই প্রশ্ন 'আমাদের কি হবে?' সাতদিনের সন্তানকে ঘরে রেখে কুয়েতে চাকরি করতে গিয়েছিলেন বেগমগঞ্জের রইছউদ্দিন। আশা ছিল হাজার হাজার টাকা নিয়ে দেশে ফিরে সন্তানের উজ্জ্বল জীবন গড়বেন। সে স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়। রইছউদ্দিন নিস্ব হয়ে দেশে ফিরে আসে। কুয়েতের কেটিসি কোম্পানিতে ড্রাইভার হিসেবে তিনি কাজ করতেন। বেতন পেতেন মাসিক ৪০ দিনার। খরচের টাকা পয়সা পাঠাননি। কুয়েত উপার্জিত টাকা কুয়েত কমার্শিয়াল ব্যাংকে জমা রেখেছিলেন। আশা ছিল কয়েক বছর চাকরি করে বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করে ফিরে কিছু একটা করে সুন্দর জীবন যাপন করবেন। কিন্তু ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে তার সব আশা মাটি হয়ে যায়। কুয়েতের ব্যাংকে তার ৫০/৬০ হাজার টাকা আটকা পড়ে। এ টাকা ছাড়াও বাসায় অনেক আসবাবপত্র ছিল তার। সেগুলোও ফেলে রেখে এসেছে। বাকি জীবন কিভাবে কাটাবে এটাই এখন তার চিন্তা।[১৭]

কুয়েতের ব্যাংকে প্রায় ৪ কোটি টাকা আটকা পড়ে তিন বাংলাদেশির। তারা হলেন, শওকত আলী, হাসান ও আলী আশরাফ।[১৮] তারা ২৫শে সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক বিচিত্রা অফিসে এসে জানান, কুয়েতে তারা ব্যবসা করতো। মাত্র ৬ মাস আগে তাদের একজন ব্যবসা করার জন্য ২২ হাজার দিনার (প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা) দিয়ে একটি দোকান নিয়েছিলেন। ব্যাংকেও জমা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ দিনার (প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা)। ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে টাকাগুলো আটকা পড়েছে।[১৯] এ টাকা পাওয়া যাবে কিনা তা অনিশ্চিত। তাদের প্রত্যেকের বাসায় কয়েক লক্ষ টাকার মালামাল ছিল। দামি গাড়ি ছিল সবকিছু কুয়েতে ফেলে রেখে দেশে এসে এখন নিঃস্ব অবস্থায় দিনাতিপাত করছে।

হাজার হাজার বাংলাদেশি ইরাক-কুয়েত হতে দেশে ফিরে মানবেতর জীবন যাপন করতে শুরু করে। তাদের দাবি ছিল ইরাক-কুয়েত সরকারের নীতিমালায় কোনো কোম্পানি থেকে চাকরি চলে গেলে তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা। ইরাক এবং কুয়েতের সরকারি অফিস আদালতে যেসব বাংলাদেশি চাকরি করতেন, তাদের চাকরি যায়নি। যেখানে ইরাক-কুয়েত সরকার কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে কর্মচারীরা বেতন পাবেন এটাই স্বাভাবিক কথা। বিশ্বের বিভন্ন দেশে ইরাক এবং কুয়েতের কোটি কোটি টাকা রয়ে গেছে। কর্মচারীদের বেতন অব্যাহত রাখা প্রবাসী কুয়েত সরকারের পক্ষে কোনো অসুবিধার কথা নয়। কাজেই ফিরে আসা বাংলাদেশিদের দাবি বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইরাক-কুয়েত সরকারের কাছ থেকে সরকারি চাকরিরত বাংলাদেশিদের বেতন আদায়ের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।[২০]

---

[১৬] তদেব, পৃ. ৩২।
[১৭] তদেব।
[১৮] তদেব।
[১৯] তদেব।
[২০] তদেব।

ইরাক-কুয়েত সংকটের ফলে দেশে ফিরে আসা বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের অভাব ও বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে।

**অর্থনৈতিক ফলাফল**

উপসাগরীয় সংকট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ন্যূনতম হিসেবেই উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পূর্বের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় হিসেবের চেয়ে ৮০০ কোটি টাকা কমে আসে, যদিও সরকারি হিসাব মতো এর পরিমাণ ধরা হয়ে ৭০০ কোটি টাকা। বেসরকারি হিসাব মতো স্ব-উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আয় ২৫ কোটি ডলার কমে আসে। যেখানে বছরে ৭৬ কোটি ডলার মধ্যপ্রাচ্য হতে আসতো, সেখানে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সৌদি আরব থেকে আসত ২২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার এবং ইরাক ও কুয়েত থেকে আসত ১০ কোটি ডলার। উপসাগরীয় সংকটের কারণে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২০ কোটি ডলার। আমদানি ব্যয় ৪০ কোটি ডলার বেড়ে যায় এবং রফতানি খাতে ৫ কোটি ডলার হ্রাস পায়।[২১]

উপসাগরীয় সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে তাজা শাক-সবজি, কাঁচা তরকারি, হিমায়িত মাছ ও শুটকি মাছ রফতানির ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাংলাদেশের রফতানিকারকগণ ১৯৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে রফতানি বন্ধ করে দেয়। ফলে বাংলাদেশ সপ্তাহে ২ লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। উল্লেখ, মধ্যপ্রাচ্যে ৪০ হাজার কেজি তাজা শাক-সবজি, ফলমূল, ১৫ হাজার কেজি হিমায়িত ও শুটকি মাছ রফতনি হতো, বিমান রফতানি ক্ষেত্রে কেজি প্রতি "যুদ্ধ ঝুকি বীমা" হিসেবে ৫ টাকা বাড়িয়ে দেয়। এতে রফতানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের আমদানিকারকগণ জানিয়ে দেয় বর্ধিত মূল্যে বাংলাদেশ থেকে তারা এসব দ্রব্য ক্রয় করবে না।[২২]

অপরদিকে উপসাগরীয় সংকটের কারণে তেলের মূল্য শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায় যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ৩০ ডলার এবং পেট্রলের দাম প্রতি ব্যারেল ১৮ ডলার থেকে ৩০ ডলার বৃদ্ধি পায়। কুয়েতের কাছ থেকে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল পেতো, কিন্তু কুয়েত ইরাকের দখলে চলে যাওয়ায় তার প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে অন্যান্য দেশ হতে বাংলাদেশকে তেল আমদানি করতে হয়। উল্লেখ্য, উপসাগরীয় সংকটজনিত কারণে বাংলাদেশ মালয়েশিয়া থেকে তেল আমদানির ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করে। বেসরকারি হিসাব মোতাবেক বাংলাদেশ ১০ লাখ মেট্রিক টন অশোধিত তেল ৭৫ হাজার মেট্রিক টন জেট পেট্রোলিয়াম, ২ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন কেরোসিন, ৭ লাখ মেট্রিক টন ডিজেল, মোট ১০ লাখ মেট্রিক টন শোধিত এবং ৪০ হাজার মেট্রিক টন লুব্রিক্যান্ট আমদানি করতো মধ্যপ্রাচ্য হতে। ২০ লাখ মেট্রিক টন তেল আমদানি খরচের বাজেট ধরা হয়েছিল ১,৪৩৫ কোটি টাকা। কুয়েতের ব্যারেল প্রতি ১৫ ডলারের রেয়াতিদের বিপরীতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলার বৃদ্ধি

---

[২১] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১-৭ই অক্টোবর, ১৯৯০, পৃ. ১৮।

[২২] সেলিম জাহান, "উপসাগরীয় সংকট ও বাংলাদেশের অর্থনীতি"। *বিচক্ষণ*, সামাজিক বিজ্ঞান সাময়িকী, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ১৪।

পাওয়ায় দ্বিগুণ মূল্যে বাংলাদেশকে তেল আমদানি করতে হয়। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি হুমকির সন্মুখীন হয়ে পড়ে।[২৩]

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় সরকার মটরগাড়ি আমদানির ওপর শুল্কহার কমিয়ে বিলাসকার আমদানিতে উৎসাহিত করে। ৭০ প্রকার আইটেমের আমদানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে, ফলে সরকারের কৃচ্ছ্রতার নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলে সন্দেহ দেখা দেয়।[২৪] উপসাগরীয় সংকটের ফলে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে।

বেসরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার পেট্রলজাত সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করা হলেও তেলের দাম প্রতি লিটারে ২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৭.৫০ টাকা থেকে ৯.২০ টাকা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে যানবাহনের ভাড়া বেড়ে যায়। বাস, মিনিবাস, অটোরিকশা অস্বাভাবিক হারে ভাড়া বৃদ্ধি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণ এবং তিনগুণ ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। এ রকম ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে দেশেব্যাপী সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা ও বিসৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় এক শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী মালিকরা তাদের যানবাহন রাস্তায় না নামালে পরিস্থিতি ভয়াবহরূপ ধারণ করে।[২৫] তেলের দাম ও বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির তৎকালীন সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে বলা হয় "সরকার ১লা অক্টোবর ১৯৯০ থেকে বাস ও মিনিবাসের ভাড়া কিলোমিটার প্রতি .৩২ ও .৩৫ পয়সা হারে নির্ধারণ করেছে। তবে জ্বালানি তেলের সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে ভাড়া বৃদ্ধির কোনো সংযোগ নেই।"[২৬]

উপসাগরীয় যুদ্ধাবস্থার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা আকস্মিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। ফলে জনসাধারণের ওপর মারাত্মক অর্থনৈতিক চাপ পড়ে। চালের দাম গড়ে মনপ্রতি ১০০ টাকা, ৫ পাউন্ড টিনজাত দুধের দাম ৪০ থেকে ৫০ টাকা বৃদ্ধি পায়।[২৭] ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের ফলে সেখানে গচ্ছিত কর্মরত বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের সঞ্চয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। রয়টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী কুয়েতে বাংলাদেশিদের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। যদিও এদের একটা অংশ নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য সাধারণ কাজে নিয়োজিত ছিল কিন্তু এদের বাইরে কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশি ডাক্তার, উঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ীর সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। এদের বড় অংশ দেশে টাকা না পাঠিয়ে কুয়েতের বিভিন্ন ব্যাংকে সঞ্চিত করে। কুয়েতের নিয়ন্ত্রণাভাবে ইরাকের হাতে চলে যাওয়ায় কুয়েতের ব্যাংকগুলোও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বেসরকারি হিসাব মতে কুয়েতে বাংলাদেশিদের প্রায় ১০০ কোটি টাকা আটকে পড়ে।[২৮] এদিক থেকেও বাংলাদেশিরা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত আমদানি সংকুচিত হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমান কমে যায়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ফেরত বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানে

---

[২৩] তদেব।
[২৪] তদেব।
[২৫] তদেব।
[২৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ই আগস্ট, ১৯৯০, পৃ. ১৪।
[২৭] *সাপ্তাহিক রোববার*, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ৩৮।
[২৮] তদেব।

সংকট দেখা দেয়। সব মিলিয়ে উপসাগরীয় সংকটের প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় এক বছরে প্রায় ২১০০ কোটি টাকা।[২৯] এর মধ্যে লক্ষাধিক বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে খরচ হয় ১২৫ কোটি টাকা। ইরাক ও কুয়েতে পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইরাক ও কুয়েত থেকে বাংলাদেশিদের বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয় প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা। তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তেল আমদানিতে বাংলাদেশের বর্ধিত ব্যয় হয় ১০০ কোটি টাকা। এছাড়া কুয়েতের উন্নয়ন তহবিল থেকে বার্ষিক ১৯৫ কোটি টাকার সাহায্য থেকেও বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়। উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আয় ২৫ কোটি ডলার কমে আসে, যার মধ্যে ইরাক ও কুয়েত হতে আসতো ১০ কোটি ডলার।[৩০] তাছাড়া ইরাক ও কুয়েত সরকারের আর্থিক সাহায্যে এবং উভয় দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে হ্রাস পায় ১২০ মিলিয়ন ডলার। কুয়েত উন্নয়ন তহবিল হতে বাংলাদেশ প্রতি বৎসর সাহায্য পেত ৫৬ মিলিয়ন ডলার এবং ইরাক ও কুয়েত কর্মরত বাংলাদেশিদের পাঠানো মুদ্রার পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৫৯২ মিলিয়ন ডলার।[৩১] সব মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা।[৩২]

**উপসংহার**

উপসাগরীয় সংকটের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নজিরবিহীন বিপর্যয় সৃষ্টি করে। উপসাগরীয় সংকটে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পূর্বের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ছাড়িয়ে যায়। উপসাগরীয় পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক আঘাত হানে। বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থায় এই নতুন সংকট মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৪ ডলার থেকে ক্রমান্বয়ে ৩১ ডলার বৃদ্ধি পায়। ইরাক ও কুয়েত তেল সরবারাহ বন্ধ করার ফলে সৌদি আরব, ইরান ও অন্যান্য তেল উৎপাদক দেশগুলোর পক্ষে বিশ্বের তেল চাহিদা পুরাপুরি মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উপসাগরীয় সংকটের কারণে বাংলাদেশের ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাপক হারে কাট-ছাট করা হয়। নতুন কোনো প্রকল্প শুরুর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এবং সরকারি সার্কুলার জারির মাধ্যমে বলা হয় যে, সংশোধিত বাজেট ও এডিপি থেকে টাকা পওয়া যাবে এমন আশা করে কোনো অর্থ খরচ করা যাবে না। তাছাড়া রাজস্ব ব্যয় ১০ ভাগ কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রিসোর্স কমিটি এডিপির জন্য সরকারের কাছ থেকে ২১০০ কোটি টাকা পাওয়ার যে প্রকল্প গ্রহণ করে, সংকটের কারণে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে প্রতি থানাতে ৫ থেকে ৮ লাখ টাকার ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের আমদানি, রপ্তানি, ওয়েজআর্নার রিমিটেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্ষেত্রে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা বিবেচনা করে ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানি আয় ধরা হয় ১৩৫ কোটি ডলার যা ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে প্রকৃত রপ্তানি

---

[২৯] তদেব।
[৩০] তদেব।
[৩১] তদেব, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৯০, পৃ. ১৪।
[৩২] তদেব।

আয় ছিল ১৫২ কোটি ডলার। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে আমদানি হয় ২৮০ কোটি ডলার, যা ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে প্রকৃত আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৬৪ কোটি ডলার। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে পরিমাণ ছিল ৩৬৪ কোটি ডলার। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ কোটি ডলার, যা ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে ছিল ৭৬ কোটি ডলার। বৈদেশিক সাহায্য ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে ছিল ১৬২ কোটি ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে দাঁড়ায় ৩৫ কোটি ডলার, যা ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে ছিল ৫২ কোটি ডলার। কাজেই এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল প্রধানত ধ্বংসাত্মক হয়েছে। এ যুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বপেক্ষা বেশি প্রভাব ফেলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর। বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। গঠনমূলক রাজনৈতিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে এ যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতো। উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে প্রাণ ও সম্পদের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। অথচ উন্নত মানসিকতার দ্বারা যুদ্ধকে পরিহার করে উক্ত সম্পদ মানব কল্যাণে ব্যয় করে সভ্যতার বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করা যেত।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার স্বরূপ

মোহাম্মদ নাজিমুল হক*

**Abstract:** Daud Khan Karrani, the last Afghan Sultan of Bengal was defeated by Akbar's General Khan Jahan in the battle of Rajmahal on 12th July 1576. Daud was beheaded and his severed head was sent to the Emperor Akbar. But the Success in the battle did not give Akbar his desired peaceful possession of Bengal. Mughal rule was established in Bengal in 1612 in the reign of Emperor Jahangir. During his time, a new *subahdar*, Islam Khan Chishti was able to bring the whole of Bengal under the Mughals by following a new policy and a new plan of operation.

## ভূমিকা

জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল শাসনের সূত্রপাত করেন। এই সময়ে বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ্-এর পুত্র নসরত শাহ্ । কিন্তু তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্কে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সাসারামের জায়গিরদারের পুত্র শের খান পরাজিত করে গৌড় দখল করেন এবং বঙ্গে সূর বংশীয় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।[১] একই বছর অর্থাৎ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় দখল করেন এবং গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে এর নাম রাখেন 'জান্নাতাবাদ'। ইতিমধ্যে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দল দিল্লির সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করে দিল্লি অভিমুখে রওনা হলে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শেরশাহ্ তাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন। পরবর্তী কালে সম্রাট আকবরের সময়ে ১৫৭৬ সালের ১২ই জুলাই রাজমহলের নিকট মুঘল ও আফগানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হলে বাংলা পুনরায় মুঘল অধিকারে আসে। কিন্তু আফগান রাজশক্তির পতন হলেও আফগান সেনানায়ক এবং বাংলার ভুঁইয়া জমিদার ও সামন্ত প্রধানেরা মুঘল শাসন মেনে না নিয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অবশেষে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর সুবাদার ইসলাম খান চিশতি সমগ্র বাংলা মুঘল কর্তৃত্বাধীনে আনেন।[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] মোঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৬৯।

[২] Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760* (Delhi: Oxford University Press, 1997), pp. 137-38.

### বাংলার সীমারেখা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল মুঘল আমলের সুবা বাংলার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, 'সুবা বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম হতে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলি জেলার মান্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। সুবা বাঙ্গালা পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে ছিল সুবা বিহার এবং সীমান্তে ছিল কামরূপ ও আসাম। মুঘল আমল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বাংলা পশ্চিমে তেলিয়াগড় হতে পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'[৩]

### ভারতবর্ষে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন।[৪] বাবরের পূর্বপুরুষ চেঙ্গিজ খান ও তৈমুর লঙ যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভারত অভিযানের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাই বাবরের বংশের ঐতিহ্য রক্ষার্থে তথা তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বাবর ভারত অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুস্তান অধিকার করার বাসনা তাঁর মনে সর্বদা জাগ্রত ছিল।[৫]

লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে অভিজাত শ্রেণী, লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খান এবং দিল্লীর সিংহাসনের দাবিদার আলম খান ইব্রাহিম লোদীর শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য সংকল্পবদ্ধ হন এবং তাঁরা কাবুলের আমির বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান জানালে বাবর সানন্দে তা গ্রহণ করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ঘটে এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন।

### বাংলায় আফগান শাসন

বাংলায় আফগান শাসন ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়। আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শের খান সূর। তাঁর পিতা হাসান খান সূর তখন বিহারের অন্তর্গত সাসারাম অঞ্চলের জায়গিরদার ছিলেন। হাসান খান সূর বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শের খানের উপর জায়গীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁর বিমাতার প্ররোচনায় শের খানকে শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের উপর শাসনভার অর্পণ করা হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইব্রাহিম লোদীর আদেশনামার বলে পুনরায় শের খান সাসারামের জায়গিরের অধিকার লাভ করেন। এই সময়ে বিহারের শাসনকর্তা জালাল খান লোহানী নাবালক ছিলেন। শের খান তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর আফগানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয় তার সুযোগে শের খানের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে আবার

---

[৩] এম.এ.রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৫।

[৪] এ.কে.এম. আব্দুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদাস, ২০০২), পৃ. ১৪৮।

[৫] A. S. Beveridge (Tr.), *Babur-Nama,* Vol. II (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 1989), p. 26.

জায়গির থেকে উৎখাত করেন। অগত্যা শের খান সম্রাট বাবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর সামরিক সহযোগিতায় সাসারামের জায়গির পুনরুদ্ধার করেন।[৬]

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম দিকে শের খান সম্রাটকে মাঝে মাঝে উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমে ক্রমে শক্তি বৃদ্ধি করেন।[৭] শের খানের বাংলা দখলের বহু পূর্বেই আফগানরা বাংলার সুলতানের অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। জৌনপুরের শর্কী সুলতানদের মতো বাংলার সুলতানগণও বিভিন্ন বিভাগে আফগানদের নিয়োগ করতেন। শেষ হাবশী সুলতান মুজাফ্ফর শাহের (১৪৯১-১৪৯৩) সময়েও সৈন্যবাহিনীতে বেশ কয়েজ হাজার আফগান সৈন্য ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ্-এর (১৪৯৪-১৫১৯) অধীনে বিভিন্ন বিভাগে বেশ কিছু সংখ্যক আফগান কর্মকর্তা ও সৈন্য ছিল। এরা পরবর্তী সময়ে সুলতান নসরত শাহের আমলে (১৫১৯-১৫৩২) সেনাপতি এবং প্রশাসক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমতাবস্থায় শের শাহ্ কর্তৃক বাংলা বিজিত হলে আফগানরা সিংহাসনে নিজেদের লোক দেখতে পান এবং তার পতাকাতলে সমবেত হন।

হুমায়ুন যখন গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন তখন শের খান সমগ্র বিহারে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং আফগানদের সংঘবদ্ধ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শের খান হুসাইন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহকে বিতাড়িত করে গৌড় দখল করেন। এর ফলে বাংলা আফগান শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৮] এদিকে শের খানের শক্তি বৃদ্ধিতে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপদ দেখা দেয়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হুমায়ুন সাময়িকভাবে গৌড় দখল করেন।[৯] কিন্তু ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শের খানের নিকট চৌসা যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন। এর ফলে বাংলা পুনরায় আফগানদের অধীনে আসে। এরপর ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে শের খানের নিকট হুমায়ুন পরাজিত হন। এরপর শের খান দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং খিজির খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বাংলায় তাঁর শাসনের সূচনা করেন। শের খান দিল্লিতে বসে সংবাদ পান যে, বাংলার গভর্নর খিজির খান বিতাড়িত ও পরলোকগত সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের মেয়েকে বিয়ে করে বাংলার সুলতানদের মতো টৌকিতে (উচ্চ মঞ্চ) বসছেন অর্থাৎ বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়েছেন। খিজির খানের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করার সুযোগ না দিয়ে শেরশাহ তাড়াতাড়ি বাংলায় ছুটে আসেন এবং খিজির খানকে অপসারণ করে কাজী ফজীলতকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করে আগ্রায় ফিরে যান। অতঃপর বাংলার শাসন ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করার জন্য তিনি ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে কাজী ফজীলতকে অপসারণ করে তার জায়গায় মুহম্মদ খান সূরকে নিয়োগ দেন।[১০]

১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খানের মৃত্যুর পর মুহম্মদ খান সূর শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। সূর বংশের চারজন

---

[৬] Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India* (Allahbad : B. P. Pvt. Ltd., 1929), p. 119.

[৭] Arnold Fletecher, *Afghanistan : Highway of Conquest* (New York: Cornell University Press, 1964), P. 112

[৮] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলার ইতিহাস : প্রাচীন কাল থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৩) পৃ, ২৪৭।

[৯] রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৪৩।

[১০] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মোগল আমল*, ১ম খণ্ড (রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২), পৃ. ৯৯।

সুলতানদের মধ্যে মুহম্মদ শাহ ও বাহাদুর শাহ যোগ্য সুলতান বলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। মুহম্মদ শাহ ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে শুধু চট্টগ্রামই পুনর্দখল করেননি বরং তিনি আরকান অঞ্চলেও আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। বিহারেও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ছপ্পর ঘাটায় সংঘটিত যুদ্ধে বাংলার সুলতান মুহম্মদ শাহ আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর হাতে পরাজিত ও নিহত হয়।[১১] এরপর শাহবাজ খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মুহম্মদ খানের পুত্র খিজির খান তাঁকে হত্যা করেন এবং গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এদিকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন; কিন্তু তিনি বাংলায় মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। তদানীন্তন শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ (১৫৫০-৬০) সম্রাট আকবরের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। বাহাদুর শাহ ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে নিহত হলে তাঁর এক ভাই জালাল শাহ ক্ষমতা লাভ করেন। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে জালাল শাহকে হত্যা করে গিয়াসউদ্দীন নামক জনৈক আফগান ক্ষমতা দখল করেন। তাজখান কররানী জবরদখলকারী গিয়াসউদ্দীনকে হত্যা করলে বাংলায় সূর আফগান বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং কররানী শাসনের সূত্রপাত হয়।[১২]

**মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব**

আফগান ও মুঘল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় শের শাহের আমল থেকে। আফগানবাসী মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুঘলদের সঙ্গে শৌর্যে ও বীর্যে পেরে উঠতো না। ফলে সূর এবং কররানী আমলেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এ বিরোধের মূলে অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমত, পাঠান আফগান সূর বংশের শেরশাহ কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্য বিজিত হলে হুমায়ুন বিতাড়িত হন। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেও হুমায়ুন তাৎক্ষণিকভাবে সুদূর বাংলায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, মুঘল সম্রাজ্যের সম্প্রসারণ নীতির প্রকৃত বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন সম্রাট আকবর। যদিও সোলায়মান কররানী আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তবুও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পাঠান রাজ্য মুঘল রাজত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। সুতরাং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বিজয় মুঘলদের জন্য অপরিহার্য ছিল।[১৩] তৃতীয়ত, সম্রাট আকবর নিজেকে ভারতবর্ষের একমাত্র অধীশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার সম্রাজ্যের বহির্ভূত থাকবে একথা তিনি চিন্তা করতে পারতেন না। কিন্তু স্বাধীনচেতা ও উচ্চাভিলাষী দাউদ খান কররানী আকবরের এই সম্প্রসারণ নীতির বিরোধিতা করেন। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, আকবরের পূর্বে তাঁর পিতা সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকভাবে বাংলা তথা গৌড় দখল করেন এবং মাত্র ছয় মাস সেখানে অবস্থান করার পর সরে যেতে বাধ্য হন।[১৪]

**হুমায়ুনের বাংলা জয় ও পরাজয়**

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুন দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হিসেবে আগ্রাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েই তিনি নানাবিধ

---

[১১] *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ১ম খণ্ড; সিরাজুল ইসলাম, সম্পা:; (ঢাকা: বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৬৭।

[১২] তদেব।

[১৩] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

[১৪] তদেব।

অসুবিধার সম্মুখীন হন। নিঃসন্দেহে আফগানদের বিরোধিতাই ছিল হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। হুমায়ুনের শাসনামলে বাংলায় আফগান শাসনের প্রবর্তক শের খান ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড় দখল করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে হুমায়ুন গৌড় দখলের পরিকল্পনা করেন।[১৫]

হুমায়ুনের বিহার অভিযানের প্রাক্কালে শের খান এক হিন্দু রাজার নিকট থেকে কৌশলে রোটাস দুর্গ দখল করেন। হুমায়ুন যখন বাংলায় প্রবেশের আয়োজন করেন তখন শের খান গৌড়ের সমস্ত ধনরত্ন রোহতাস দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। এই জন্য আফগান সৈন্যরা তেলিয়াগড় প্রবেশ পথে কিছুদিনের জন্য মুঘল সৈন্যদেরকে বাধা দিয়ে রাখে। এরপর বিনা বাধায় হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করেন এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গৌড় অধিকার করেন। তিনি প্রায় ছয় মাস গৌড়ে অবস্থান করেন এবং আমোদ ফুর্তিতে কাটান। ইতিমধ্যে তাঁর সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। শের খান বিহার পুনরুদ্ধার করেন এবং হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভাই হিন্দল দিল্লির সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এইসব কারণে হুমায়ুন দিল্লি যাত্রার আয়োজন করেন। তিনি জাহাঙ্গীর কুলীকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বিজিত প্রদেশ রক্ষার জন্য ৫০০ মুঘল সৈন্য গৌড়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। এরপর হুমায়ুন দিল্লি অভিমুখে রওনা হন (মে, ১৫৩৯ খ্রি.)। হুমায়ুন বক্সারের নিকটে গঙ্গা নদীর তীরে পৌঁছিলে চৌসা নামক স্থানে শের খান তাকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটে (৮ জুলাই ১৫৩৯ খ্রি.)। এ সময়ে নিযাম নামক একজন ভিস্তিওয়ালা (মাঝি) তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন।[১৬]

চৌসা যুদ্ধে জয়লাভের পর শেরখান শের শাহ্ উপাধি ধারণ করে বিহারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ত্বরিত গতিতে গৌড় আক্রমণ করেন এবং মুঘল শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী ও তার অনুচরদের হত্যা করে বাংলার রাজধানী অধিকার করেন। বাংলা ও বিহারে আধিপত্য স্থাপন করে শের শাহ উত্তর ভারতের অনেক স্থান দখল করেন। তাঁকে দমন করার জন্য হুমায়ুন আবার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন। হুমায়ুনের সাথে শের শাহের কনৌজের নিকটে যুদ্ধ হয়। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন আবার পরাজিত হন (১৭মে ১৫৪০ খ্রি.)। বিজয়ী শের শাহ দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন এবং হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে উত্তর ভারতে সুর-আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭]

এই আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, শের শাহের দখল থেকে বাংলাকে মুঘল শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে গিয়ে প্রকারান্তরে হুমায়ুন দিল্লি এবং বাংলা উভয়েরই কর্তৃত্ব হারান। এই সমস্ত কারণে ইতিহাসে হুমায়ুনকে একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত সম্রাট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

### আকবরের বাংলা জয়

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান জাহানের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হন। ফলে বাংলার আফগান শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুঘল শাসন সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। প্রকৃত পক্ষে বাংলায় মুঘল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

---

[১৫] আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৭।

[১৬] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৪০।

[১৭] Hardy, *Historian of Medieval India* (London : Liuzac & Co. 1960), p. 120.

আগেই ১৬০৫ খ্রি. আকবরের মৃত্যু হয়। পরবর্তী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮]

সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য তথা মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্রাট আকবর বহুদিন ধরে কররানী রাজ্য জয়ের সুযোগ খুঁজছিলেন। তাছাড়া, বিহার ও বাংলা একদা তাঁর পিতার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এই প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধার করা তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে, আফগানরা মুঘলদের পরম শত্রু এবং সুযোগ পেলেই তারা আবার মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। তাঁর আশঙ্কা ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শক্তিশালী আফগান রাজ্য হতে যে কোনো সময় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপদ ঘটতে পারে। এই অবস্থায় কররানী রাজ্য জয় করে আফগান শক্তি নির্মূল করা মুঘল সম্রাটের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন সম্রাট আকবর গুজরাট জয়ের জন্য অভিযান শুরু করেন, তখন তিনি শক্তিশালী আফগান নেতা সোলায়মান কররানীর মৃত্যু সংবাদ পান। এমতাবস্থায় সম্রাট আকবর কররানী রাজ্য জয়ের জন্য জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে নির্দেশ দান করেন।

মুনিম খানের নেতৃত্বে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের বিহার আক্রমণ শুরু হয়। কররানী রাজ্যের উজির লোদী খান তিন লক্ষ টাকা এবং মূল্যবান উপঢৌকন করস্বরূপ দিতে স্বীকার করায় মুঘল সেনাপতি দাউদ কররানীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন এবং যুদ্ধ স্থগিত করে জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সংবাদে সম্রাট আকবর মুনিম খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে পুনরায় বাংলা-বিহার অধিকারের নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে দাউদ কররানী তার সুযোগ্য উজির লোদীকে হত্যা করে নিজের সর্বনাশ করেছেন। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুনিম খান সর্বশক্তি নিয়ে বিহার আক্রমণ করেন। মুঘলদের তীব্র আক্রমণের মুখে দাউদ কররানী এবং তার সেনাপতিরা পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হন এবং পাটনায় অবস্থান গ্রহণ করেন। প্রায় ৯ মাস পাটনা অবরোধ করে ব্যর্থ হয়ে সম্রাট আকবরের নির্দেশনায় মুঘল সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকেন্দ্র হাজীপুর দখল করে। ফলে দাউদ কররানীর সেনাপতিরা নিরাশ হয়ে পড়েন। অতঃপর দাউদ মুঘলদের পাটনা প্রবেশে বাধা দিতে মনঃস্থ করেন। কিন্তু তার সেনাপতি ও পরামর্শদাতা কতলু গুজর ও শ্রীহরি তাঁকে অজ্ঞান করে নৌকাযোগে পাটনা হতে রাজধানী তান্ডায় নিয়ে যান (১০ আগস্ট, ১৫৭৪ খ্রি.)।[১৯] এমতাবস্থায় সম্রাট আকবর পাটনা দখল করেন এবং কিছু দুর পর্যন্ত পলায়নপর আফগানদের অনুসরণ করেন। এরপর মুনিম খানের উপর দায়িত্ব অর্পন করে তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তুকারয় নামক প্রান্তরে আফগান ও মুঘল বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষে জয় পরাজয় নিশ্চিত না হওয়ায় উক্ত বছরের ১২ এপ্রিল ঐতিহাসিক কটকের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও বিহার মুঘল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্থির হয় যে, দাউদ সম্রাটের সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসন করবেন। আপাত সন্তুষ্ট দাউদ সম্রাটের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য মুঘল রাজধানীর দিকে মুখ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন।[২০]

বাংলা জয় শেষে মুনিম খান তাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। গৌড়ের প্রাসাদাবলীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সেখানে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এরপর গৌড়ে প্লেগের মহামারী দেখা দেয়।[২১] এতে অনেক মুঘল সেনা ও সেনাধ্যক্ষের মৃত্যু হয়। মুনিম খান তাঁর লোকজন নিয়ে তাণ্ডায়

---

[১৮] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মোগল আমল*, পৃ. ২৫।

[১৯] রহিম ও অন্যান্য, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ২৪৫।

[২০] Hardy, *Historian of Mediaval India,* p. 129.

[২১] হাসান, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ২৫৬।

ফিরে আসেন। তবে তাণ্ডায় পৌঁছানের পূর্বেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তিনি মারা যান। মুনিম খানের মৃত্যুতে মুঘল সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে দাউদ পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুরুদ্ধার করেন এবং রাজধানী তান্ডায় পুন:প্রবেশ করেন। এছাড়া ভাটির জমিদার ঈশা খান পূর্ব বাংলা থেকে মুঘল নৌবহর বিতাড়িত করেন। শেষ পর্যন্ত মুঘল সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে বিহারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[২২]

**বার ভুঁইয়াদের দমন এবং সার্বভৌম মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা**

আফগানদের পতন ও মুঘল শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অনেক ভুঁইয়া, সেনাপতি ও যোদ্ধা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে রেখেছিলেন এবং স্বাধীন বা আধা-স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করছিল। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘল শাসন মেনে না নিয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এই জমিদাররা 'বার ভুঁইয়া' নামে খ্যাত। তাদের আমলের বাংলাদেশ 'বার ভুঁইয়ার মুল্লুক' নাম অভিহিত হয়।[২৩]

বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করার জন্য আকবর ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তার অধিকৃত বাংলায় সুবাদার পদে নিয়োগ করেন খান-ই-আজমকে। তেলিয়াগড় এক যুদ্ধে তার নিকট আফগান জমিদার মাসুম খান কাবুলী পরাজিত হন। বার ভুঁইয়াদের নেতা ঈশা খানের আশ্রয়ে চলে আসেন মাসুম খান কাবুলী।[২৪] তারপর আকবর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর খ্যাতনামা সেনাপতি শাহবাজ খানকে ভুঁইয়াদের দমনের জন্য বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব প্রদান করেন। শাহবাজ খান বার ভুঁইয়াদের নেতা ঈশা খান ও মাসুম কাবুলীর অনুপস্থিতিতে তাদের জামিদারি আক্রমণ করে সোনারগাঁও ও এগারসিন্দূর হস্তগত করে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে টোক নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। কুচবিহার থেকে ফিরে এসে ঈশা খান ও মাসুম কাবুলী তাঁদের জমিদারী থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করেন।[২৫]

১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলার সুবাদার হিসেবে রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে মানসিংহ রাজধানী তাণ্ডার পরিবর্তে রাজমহলে নিয়ে আসেন। মানসিংহের সঙ্গে বার ভুঁইয়াদের বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ হতে থাকে। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ ও ঈশা খানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঈশা খান মুঘল বন্দীদেরকে মুক্তি দেন এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খান মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র মুসা খান বার ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মানসিংহ বেশ কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।[২৬] অতঃপর সম্রাট আকবরের মৃত্যু সংবাদে মানসিংহ ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় ফিরে যান।

বার ভুঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন ভাটির রাজ্যের অর্থাৎ সোনারগাঁয়ের ঈশা খান। তিনি অন্যান্য ভুঁইয়াদের নিয়ে জোট গঠন করেন এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের নেতৃত্ব দেন। ঈশা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান বার ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেন।

---

[২২] রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ. ২৫১।

[২৩] R.C. Majumder, *History of Bengal*, Vol.1 (Dhaka:University of Dhaka, 1957), p. 62.

[২৪] Ibid.

[২৫] Ibn Hasan, *The Central Structure of the Mughal Empire* (London: Oxford University Press, 1936), p. 162.

[২৬] S. A. Q. Hossaini, *Administration under the Mughals*, Dhaka, 1952, p. 107.

ইসলাম খান চিশতি ফতেহপুরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম শায়খ আলা-উদ-দীন চিশতী এবং বয়সে সম্রাট জাহাঙ্গীরের চেয়ে বৎসর খানেক ছোট চিলেন। ইসলাম খানের সাধারণ শিক্ষা বা সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, তবে অভিজাত পরিবারে জন্ম হওয়ায় ধরেই নেওয়া যায় যে তিনি প্রাপ্ত সুযোগের ব্যবহার করেন। সেই কালে জীবনে প্রতিষ্ঠত হওয়ার জন্য সামরিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এবং তিনি সামরিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইসলাম খান চিশতি বাংলার সুবাদার হওয়ার পূর্বে বিহারের সুবাদার ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। সুবাদার ইসলাম খান তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে আসেন এবং রাজমহলে বসেই তিনি উচ্চ পদস্থ সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর বাংলা জয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম বাধা বার ভুঁইয়া এবং দ্বিতীয় বাধা খাজা উসমান আফগান, যাঁদের ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ব বাংলা। তিনি বুঝতে পারলেন যে, বার ভুঁইয়া এবং উসমান আফগানকে পরাজিত করতে হলে তাঁকে পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে জয় করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলা জয় করতে হলে তাঁকে সেখানেই ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে এবং নিজেকেও পূর্ব বাংলায় অবস্থান করতে হবে। তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলা জয়ের জন্য তাঁর দরকার একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী, কারণ, নদী-মাতৃক পূর্ব বাংলায় বছরের অর্ধেক সময় অশ্বারোহী বাহিনী অচল থাকে। বার ভুঁইয়াদের শক্তির উৎস ছিল নৌবাহিনী। তাঁরা নৌ-যুদ্ধে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিত।[২৭] এমতাবস্থায় ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আসেন এবং তাঁর ঢাকা আগমনের তারিখেই ঢাকায় বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লির সম্রাটের নামানুসারে তিনি এই নগরীর নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর। বার ভুঁইয়াদের শক্তিশালী নৌবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন এবং ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে রওনা হন । এভাবে জল ও স্থলে বারো ভুঁইয়াদের দমনের ব্যবস্থা করেন।[২৮]

সুবাদার ইসলাম খান কূটনীতির সাহায্যে বার ভুঁইয়াদের ঐক্য নষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ উদ্যোগ সফল হয়। তাঁর এ উদ্যোগের ফলে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য স্বেচ্ছায় মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। একইভাবে বিষ্ণুপুরের জমিদার বীর হামির, বীরভূমের জমিদার শামস্ খান এবং হিজলীর জমিদার সলিম খান মুঘলদের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হন। ভূষণা অঞ্চলের জমিদার ছত্রজিৎ কিছুকাল প্রতিরোধের চেষ্টা করে অবশেষে মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে ইসলাম খানের সঙ্গে যোগ দেন। ছত্রজিতের সাহায্যে ইসলাম খান ফতেহাবাদ আক্রমণ করেন এবং সেখানকার জমিদার মজলিস কুতুবের নিকট থেকে ফতেহাবাদ অধিকার করেন।[২৯]

অতঃপর ইসলাম খান শাহজাদপুর আসেন এবং মুসা খানের ভাটি রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি মুসা খানের দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বয়-যাত্রাপুর এবং ডাকচরা অধিকার করেন। এরপর তিনি সোজা ঢাকার দিকে অগ্রস ঢাকা পৌঁছান। মুসা খান ও তাঁর মিত্রগণ ঢাকার পূর্বে শীতলক্ষা নদীতে মুঘলদের বাধা দিতে প্রস্তুত হন। তাঁরা শীতলক্ষা নদীর পূর্ব তীরের দুর্গগুলোকে সুরক্ষিত করেন। ইসলাম খান শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম তীরে রণ-প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ১২ই মার্চ উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মুঘলগণ মুসা খানের কত্রাবু দুর্গ ও কদমরসুল দুর্গসহ কতিপয় দুর্গ হস্তগত করেন। ফলে মুসা খান পশ্চাদ্ধাবন করে রাজধানী সোনারগাঁওয়ে ফিরে যান। তখন মুঘল বাহিনী তাঁর পশ্চাদধাবন করে

---

[২৭] আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*, (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১৪৮।

[২৮] তদেব।

[২৯] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*: ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ. ১৩৮।

সোনারগাঁও অধিকার করেন। মুসা খান মেঘনা নদীর ইব্রাহীমপুর দ্বীপে আশ্রয় নেন এবং এক পর্যায়ে মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন।[৩০]

বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা নিয়ে প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য গঠিত ছিল। এবং ঐ সময়ে রাজা ছিলেন অনন্ত মাণিক্য। মুসা খানের পরাজয়ের পরে ইসলাম খান অনন্ত মাণিক্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। এদিকে মুসা খান পরাজিত হলেও আত্মসমর্পণ করেননি, আবার যে কোনো সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেন এবং ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্যের সাথে মুসা খানের যোগাযোগ হলে বিপদ হতে পারে। ইসলাম খান হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদীসহ কয়েকজন সেনাপতিকে আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে অনেক সৈন্য সামন্ত এবং পঞ্চাশটি হাতিসহ ভুলুয়ার বিরুদ্ধে পাঠান। ওয়াহিদকে বলা হয়, যদি অনন্ত মাণিক্য আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহলে তাঁকে হয় শৃঙ্খলিত করে নিয়ে আসতে হবে অথবা তাঁর মাথা কেটে নিয়ে আসতে হবে। অনন্ত মাণিক্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় না, তিনি ইসলাম খানের আগ্রাসনের প্রতি সজাগ ছিলেন এবং আরাকানের মগ রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ভুলুয়ার পরেই চট্টগ্রাম এবং তখন চট্টগ্রাম পর্যন্ত আরাকানের অধিকারে ছিল। ফেনী নদী ছিল দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত। সমুদ্রপথেও আরাকানের সঙ্গে ভুলুয়ার যোগাযোগ ছিল। আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে মুঘল অভিযানের সংবাদ পেয়ে অনন্ত মাণিক্য আরাকানের রাজার সহযোগিতায় রাজধানী ভুলুয়াকে সুরক্ষিত করেন এবং নিজে খুব করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ডাকাতিয়া খালের তীরে এসে একটি দুর্গ তৈরি করেন এবং শত্রুদের আগমণের অপেক্ষা করতে থাকেন। মুঘল বাহিনী সেখানে পৌঁছলে যুদ্ধ শুরু হয় এবং উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। রাতে অনন্ত মাণিক্য আক্রমণ পরিচালনা করেন। মুঘল বাহিনী গ্রামে গ্রামে লুটতরাজ ও গ্রামবাসীকে মুঘলদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন এবং কেউ অস্বীকার করলে তাকে শৃঙ্খলিত করা বা হত্যা করা হয়। এ অভিযানে ভীত হয়ে অনন্ত মাণিক্যের প্রধানমন্ত্রী মির্জা ইউসুফ বারনাম মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পন করেন। অনন্ত মাণিক্য রাজধানী ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে প্রতিরক্ষা জোরদার করে যুদ্ধ করার মনস্থ করেন। কিন্তু মুঘল বাহিনী তাঁকে সেই সুযোগ না দিয়ে তাঁকে এমনভাবে করেন যে তিনি ফেনী নদী পার হয়ে আরাকানের রাজার আশ্রয়ে চলে যান। ভুলুয়ার সকল হাতি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি মুঘলদের হস্তগত হয়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই চট্টগ্রাম সীমান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা মুঘল অধিকারে চলে আসে।

সুবাদার ইসলাম খান ভুলুয়ার জমিদার অনন্ত মাণিক্যের বিরুদ্ধেও অভিযান করেন। এ অভিযানের নেতা ছিলেন আব্দুল ওয়াহিদ। এ অভিযানে ভীত হয়ে ভুলুয়ার জমিদার অনন্ত মাণিক্যের প্রধানমন্ত্রী মির্জা ইউসুফ বারলাস আত্মসমর্পণ করেন। ফলে ভুলুয়া মুঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬১১ খ্রি.)। এরপর সুবাদার ইসলাম খান সৈয়দ হাকিমকে বাকলা জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। সৈয়দ হাকিম বাকলার রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন (১৬১১ খ্রি. ডিসেম্বর) যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ইতিপূর্বে সুবাদার ইসলাম খানের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু পরে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন।[৩১] এজন্য ইসলাম খান তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে তাঁকেও পরাজিত করেন এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন (১৬১২ খ্রি.)। প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁর পুত্রদের দিল্লিতে প্রেরণ করা হয়।[৩২] তাছাড়া,

---

[৩০] Jadunath Sarker, *The History of Bengal*, Vol. II (Dhaka: University of Dhaka, 1972), p. 165.

[৩১] Ibid.

[৩২] কে.এম.রাইছউদ্দীন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, ৪র্থ সংস্করণ (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোঃ, ১৯৯৪), পৃ. ১৭৭।

রাজশাহী অঞ্চলে অবস্থিত পুঠিয়ার জমিদার পীতাম্বর, চিলাজুয়ারের জমিদার অনন্ত এবং আলাইপুরের জমিদার ইলাহি বক্শকে বশ্যতা স্বীকার ও খাজনা প্রদানে বাধ্য করা হয়।

বোকাইনগরের আফগান জমিদার উসমান খান লোহানী মুঘলদের বিরোধিতা করেন। বোকাইনগর বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। উসমান খান মুঘল অধিকৃত আলপসিংহ দখল করেন। এ কারণে ইসলাম খান তাঁর বিরুদ্ধে বিশাল অভিযান পরিচালনা করেন। মুঘল বাহিনী আলপসিংহ পুনরুদ্ধার করেন এবং বোকাইনগর অধিকার করেন (১৬১১ খ্রি.)। কিন্তু উসমান খান পালিয়ে সিলেট যান। এবার ইসলাম খান খ্যাতনামা সেনাপতি সুজাত খানকে উসমান খান লোহানীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দক্ষিণ শ্রীহট্টের দৌলম্বাপুরের যুদ্ধে (১৬১২ খ্রি. ১২ মার্চ) উসমান খান পরাজিত ও নিহত হন।[৩৩]

সিলেটের জমিদার বায়েজিদ কররানী স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি কররানী বংশের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি উসমান খান লোহানীর পরিণতি দেখে মুঘল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাছাড়া বানিয়াচংয়ের জমিদার আনোয়ার খানসহ অনান্য জমিদারগণও আত্মসমর্পণ করেন। এভাবে সুবাদার ইসলাম খান সমগ্র বাংলায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার করেন। সম্রাট আকবরের শক্তিশালী সেনাপতি মানসিংহ তাঁর সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান চিশতি বাংলার সুবাদার (১৬০৮-১৬১৩) হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ১৬১২ খ্রি. ইসলাম খান সমগ্র বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের প্রবর্তন করে অদ্ভুত দক্ষতা, সাহস ও জ্ঞানের পরিচয় দেন। সম্রাট আকবরের সময় মুঘলরা বাংলা জয় করেছিল বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা জয়ের গৌরব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য।

**উপসংহার**

সাম্রাজ্য শাসনের প্রথম দিকে নানাবিধ সমস্যা, যেমন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করা এবং রাজপুত ও আফগানদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত রাজ্য বাংলায় অভিযান করতে পারেননি। তাঁর পুত্র হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে মাত্র ছয় মাস সেখানে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুলাই তিনি চৌসা যুদ্ধে শের শাহের নিকট পরাজিত হন। ফলে সাময়িকভাবে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসনের অবসান ঘটে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মে কনৌজের যুদ্ধে আবারও শের শাহের হাতে হুমায়ুন পরাজিত হন। এতে দিল্লীর শাসন শের শাহের হাতে চলে যায়। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহী বংশের অবসানে বাংলায় কররানী বংশের শাসন শুরু হয়।

অপর দিকে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত রাজ্য বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম দুই জন সম্রাট অর্থাৎ বাবর এবং হুমায়ুন কৃতকার্য হতে পারেননি। হুমায়ুনের পুত্র আকবরের শাসনামলে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই বাংলায় আফগান শাসক দাউদ খান কররানী পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর বাংলায় মুঘল সম্রাটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত মুঘলের রাজ্য শাসন এদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর মনোনীত সুযোগ্য সুবাদার ইসলাম খান বাংলার স্বাধীন মনোভাবাপন্ন বার ভুঁইয়াদের সম্পূর্ণ পরাভূত করেন এবং ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ বাংলায় পূর্ণ মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

---

[৩৩] মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৩৮।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# বাঙালির দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনে দ্রাবিড় প্রভাব

অশোক বিশ্বাস*

**Abstract:** The aim of this paper is to demonstrate the straight line of ethno-cultural connection between Dravid and Bengali speaking peoples. From the prehistoric period, Dravid peoples themselves came to this country to change their fate, to build a new civilization. In Addition, they were brought to fight against the landlord of Bengal by Adisura, Rajendrachola, Chalukya of Karnataka, Deccan etc. After occupying the country they started to live there. Then they assimilated and expanded their culture, language, and their image of goddess among the then local peoples. In this paper the researcher explores the contribution and influence of Dravid peoples on buildings the image of goddess, their worship and religious philosophy of Bengali speaking peoples.

## ১. ভূমিকা

বাঙালির ধর্মীয় দর্শনে দেবদেবী ও তাঁদের উদ্দেশে পূজাপার্বণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দেবদেবীর স্থায়ী ও অস্থায়ী মূর্তিতে বাঙালি অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে তার ও তার পরিবারের, সমাজের শান্তি ও কল্যাণ, উন্নতি ও মুক্তি কামনা করে। বাঙালির চিন্তায়-চেতনায়, প্রেমে-সাধনায়, মোক্ষপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় যে দেবদেবীর মূর্তি ও তাঁদের ঘিরে পূজার্চনা হয় তার উৎস আর্যদের থেকে নয়; এটার উৎস অনার্যের। বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল কিনা এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ম্যাক্সমুলার, উইলিয়ামস, অবসন মার্টিন, পণ্ডিত আলবেরুণী প্রমুখ বিদ্বানগণ বৈদিক আর্যদের মধ্যে মূর্তি পূজার অস্তিত্ব ছিল না বলে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে, Bollonson, অবিনাশচন্দ্র দাস মনে করেন আর্যদেরও দেবদেবীর মূর্তি ছিল, তবে পূজা করা হতো না। বৈদিক যুগে আর্যদের দ্বারা মূর্তি গড়া হতো ও তাঁর পূজার প্রচলন ছিল—এরূপ অভিমত কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তবে ঋগ্বেদে কতিপয় দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, যেমন: ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ, বরুণ, অশ্বিনী, সূর্য, সাবিত্রী, বিষ্ণু, পৃথ্বি, অগ্নি, সোম প্রভৃতি। আর্যরা পার্থিব জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় এসব নিরাকার দেবদেবীর প্রার্থনা করত, যাগযজ্ঞ করত। এঁদের উদ্দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, যব, মাংস আহুতি দিত। তাই বলা যায়, মূর্তির উৎস, আবিষ্কার ও তাঁদের পূজাপার্বণ পালন শুরুটা অনার্যদের দ্বারা হয়েছিল। বাঙালির রক্তে যে অনার্য ভাষাভাষীদের শোণিত প্রবহমান তারা হলেন দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও তিব্বত-বর্মী। এইসব অনার্য জাতিগুলোর মধ্যে আবার যারা হিন্দুধর্মাবলম্বী, তারাই দেবদেবীর মূর্তিকল্পনা ও পূজাপার্বণ পালন করে। হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তিকল্পনায় ও তাঁদের ঘিরে পূজাপার্বণ,

* ড. অশোক বিশ্বাস, সহকারী সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

উৎসব আয়োজনের পেছনে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অবদান যে সর্বাধিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রবন্ধ সেই বিষয়ে আলোকপাত করবে। ভারত তথা বঙ্গদেশে চারটি মূল ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিকভাষী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে (সান্তাল, মুণ্ডা, হো, খেড়িয়া, জুয়াং ইত্যাদি) মূর্তিপূজার কোনো স্থান ছিল না, যা দেখা যায় তা অর্বাচীন কালের। অস্ট্রিকরা মূলত অশরীরী শক্তিতে বিশ্বাসী। আর্যসংস্কৃতি ছিল মূর্তি সংরক্ষণ ও পূজার জন্য মন্দির তৈরির পরিপন্থী। আর দেবদেবীর মূর্তি কল্পনায় ভোট-বর্মীদের অবদান খুবই সীমিত, এবং তা কেবল উত্তরপূর্ব ভারতে ও দক্ষিণপূর্ব ভারতেই সীমাবদ্ধ। বাঙালির ধর্মীয় চিন্তায়, মূর্তি কল্পনায় তাঁরা স্থান পায়নি। দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা ও তাঁদের ঘিরে আচরিত, পালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ তাই দ্রাবিড়দেরই দান। মূর্তি সংরক্ষণের জন্য সুদৃশ্য যে মন্দির নির্মিত হয়েছে ভারতবর্ষে—তা প্রাচীনতা ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে দক্ষিণভারত অদ্বিতীয়।

বাঙালির ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ ধর্ম নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দিক দিয়ে বাঙালির ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামধর্মে কোনো মূর্তির প্রার্থনা ও কল্পনা অনুমোদিত নয় বলে তাদের মধ্যে দ্রাবিড় প্রভাব কতটুকু তা নির্ণয় করা বা আলোচনা করা দুঃসাধ্য, এবং এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যও তা নয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের দেবদেবীর অর্চনা স্বীকৃত নয়, যদিও তাদের মধ্যে সামান্য হলেও এখনো দেবদেবীর প্রভাব ও প্রার্থনা প্রচ্ছন্নভাবে বহাল আছে। সুতরাং এই প্রবন্ধ বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় দর্শনে ও দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ ও তাঁর পূজায় দ্রাবিড় প্রভাব কতটুকু তা প্রমাণ করা-ই মুখ্য। বাঙালি হিন্দু আবার বহু সম্প্রদায়ে (castes) ও বর্ণে (race) বিভক্ত। বাঙালি তফশিলি ও আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বেশ কিছু দেবদেবী আছে, যা তাদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যেই পূজিত হয়। এই প্রবন্ধ বাঙালি হিন্দু এক বা একাধিক জাতি (castes), জাতিগোষ্ঠী এবং এমনকি হিন্দুধর্মাবলম্বী সকল মানুষের পূজিত দেবদেবী—যাঁরা দ্রাবিড়ভাষীদের মাধ্যমে বাংলায় আগত, পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত, এমনকি অনেকক্ষেত্রে বাঙালির সমাজজীবনে একান্ত স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে শুধু সেইসব দেবদেবীর আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

বাঙালির ধর্মে দ্রাবিড় প্রভাব আছে এরকম কথা শুনলে অনেকেই বিস্মিত হবেন, কেউকেউ নড়েচড়ে বসবেন। আসলেই কি ব্যাপারটি সত্যি! বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে রয়েছে। অনেকেই হয়ত মনে করবেন বাঙালির ধর্ম আর্যধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত এটা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু দ্রাবিড়দের দেবদেবী ও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত এটা সম্ভব কি! বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট তলিয়ে দেখার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত পৌঁছানোর প্রয়োজন আছে বৈকি। বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক, বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ বাঙালির শোণিতে-সংস্কৃতিতে-ধর্মে-ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব আছে একথা স্বীকার করেননি। যাঁরা স্বীকার করেন নি তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ববিদ অতীন্দ্র মজুমদার উল্লেখ্যযোগ্য। কয়েকজন পণ্ডিত স্বীকার করলেও তা নিয়ে আলোচনা বা যুক্তির জাল বিস্তার করেননি, বা যাবতীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার গভীরে যাননি।

## ২. বাঙালির ধর্মে দ্রাবিড় প্রভাবের কারণ

সিন্ধু তীরবর্তী আর্যদের ধর্মই পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নয়। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে গঙ্গা নদীর ধার বেয়ে বাংলাদেশে আর্যজাতি ও ধর্মের ক্রমবিস্তার হয়। এ দেশীয় আর্যপূর্ব মানুষেরা বৌদ্ধধর্মের বলয় থেকে বেরিয়ে দলে দলে হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও পালন শুরু করে। কিন্তু তাই বলে সে-ধর্ম আর্যপূর্ব সর্বপ্রাচীন ধর্ম ও দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারেনি। আর্যদের ধর্ম এ দেশীয় সর্বপ্রাচীন ধর্ম-দর্শনের ও এ দেশের

প্রাচীন মানুষের উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেও বাংলার প্রাচীন ধর্ম ও তার দর্শনকেও নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করেছে, করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ আর্যপূর্ব কৌম জাতিগুলো তাদের আদি ধর্মকে সযত্নে লালন ও পূজাপার্বণ করেছে; সর্বদাই সেগুলোকে জীবন্ত রেখেছে। আর্যপূর্ব বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক কালপর্ব থেকেই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকগণ প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে—দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপূর্ব বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলো ব্যতীত—বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জনপদে বসবাস করত বলে ধারণা করা যায়। কারণ, এদেশের প্রতীকপূজায় ও বৃক্ষপূজায়, কৃষিসভ্যতায় সমগ্র বাঙালির আচারে-সংস্কারে-বিশ্বাসে অস্ট্রিক প্রভাব এখনো সর্বব্যাপী। আর মূর্তিপূজায়, বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যসভ্যতায়, শিল্পকলায়, নগরসভ্যতা নির্মাণে, বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দ্রাবিড় প্রভাব সর্বাধিক—তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বাংলায় মঙ্গোলীয়দের বসবাস ছিল। সেজন্য এসব এলাকার অস্ট্রিক-দ্রাবিড় প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম ও অর্বাচীন।

দ্রাবিড় জাতিই দেবদেবীর রূপ কল্পনা করে মূর্তি নির্মাণ, ও মূর্তির পূজার্চনা শুরু করেন। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে, নিম্নবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে মূর্তিপূজা সর্বাধিক প্রচলিত। এসব পূজার বহিরঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবের চিহ্ন যদিও লেগেছে, তবুও গ্রাম্যদেবতা, গ্রাম্যথানপূজা, শিব, মনসা, কালীর মূর্তিনির্মাণ ও পূজাপার্বণ প্রাচীনকালে দ্রাবিড়দের উপস্থিতি ও প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ, অস্ট্রিকভাষী আদিবাসীদের ধর্মীয় চেতনায় ও দর্শনে দেবদেবীর মূর্তিনির্মাণ প্রসঙ্গই ছিল না। এ প্রসঙ্গে ড.সুহৃদ কুমার ভৌমিক বলেছেন, "ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোল বা অসুরগোষ্ঠীর (অস্ট্রিকভাষী সকল জাতিগোষ্ঠীর) সবচেয়ে বড় অবদান হল বিমূর্ত (abstract) শক্তির উপাসনা। কোনো দেবতার মূর্তি নির্মাণ করে সেই দেবতার আরাধনা এঁদের বিধানে নেই।"[১] তবে আদি ঐতিহাসিক কাল থেকে যখন অস্ট্রিকভাষী ও দ্রাবিড়ভাষী কৌম জনগোষ্ঠীগুলো পাশাপাশি বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল, যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মেলামেশা ইত্যাদি শুরু হয়েছিল তখন থেকেই উভয় ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীগুলোর ধর্মবিশ্বাস, আচার-সংস্কার, রীতিনীতি, মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ইত্যাদির সমন্বয় ও গ্রহণ-বর্জন শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ আদিকাল থেকেই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে ধর্ম নবরূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে আর্যধর্মের আগ্রাসনে দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিতে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ ও ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য শুরু হয়েছে, আচার-সংস্কার অনুষ্ঠান বিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে যেমন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ধর্ম তার আদি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়নি, তেমনি আর্যদের ধর্মীয় চিন্তা ও দর্শনে, পূজাপ্রথার মধ্যে অস্ট্রিক ধর্মীয় দর্শন, চিন্তা-বিশ্বাস-সংস্কার ঢুকে পড়েছে। আর দ্রাবিড় ধর্মীয় দর্শন, মূর্তি নির্মাণ ও তাঁর পূজাপার্বণ, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যধর্মে আত্তীকৃত হয়েছে। আর্যরাই এসব অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ধর্মবিশ্বাসকে সামাজিক স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, সংস্কৃত মন্ত্রাদি, উপকথা, ব্রতকথা সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রাবিড় দেবদেবীর সাথে বৈদিক দেবদেবীর একটি সত্তায় মিলনের প্রাণান্ত প্রচেষ্টাও কখনো-কখনো করেছে বলে দৃশ্যমান। অর্থাৎ আর্যরাও সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনভাবে এসব আদিবাসী ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন ও মূর্তিকে আর্যীকৃত ও আপন করে নিয়ে এক বৃহত্তর হিন্দুধর্মীয় দর্শন ও জগৎ সৃষ্টি করেছে। সে-কারণে গভীরভাবে এসব ধর্মীয় দর্শন ও দেবদেবীর উৎস, পূজাচার, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-

---

[১] সুহৃদকুমার ভৌমিক, "আদিবাসী দর্শন ও বাঙালি হিন্দুর ধর্মচেতনা" *পূর্বাদ্রি*, লোকধর্ম সংকলন সংখ্যা, দশম বর্ষ, ১৯৮৯, পৃ. ২৮৭।

বিশ্লেষণ না-করলে বুঝতে পারা যায় না—কোনটি অস্ট্রিকদের, কোনটি দ্রাবিড়দের আর কোনটি আর্য বা তিব্বত-বর্মীদের।

বাঙালির পূর্বপুরুষগণ (forefathers) হাজার দুয়েক বছর আগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শে এসেও তাদের নিজেদের আদি দেবদেবী, ধর্মীয় দর্শন, বিশ্বাস-সংস্কার এখনো অনেকটাই যে বহাল রেখেছে—বিচার বিশ্লেষণে তা ধরা পড়ে। আজো এমন কিছু লৌকিক দেবদেবী, এমন কিছু আর্যীকৃত দেবদেবীর এ দেশীয় তফশিলি হিন্দুদের (scheduled castes) মধ্যে এত বেশি জনপ্রিয়, এত বেশি অতীত ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল রয়েছে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবী ও তাঁদের পূজাপার্বণের অনেকগুলোই এই দুই শ্রেণীর সমাজে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। সেজন্যে সমাজে এখনো বিভিন্ন দেবদেবী যেমন-মনসা, কালী, শীতলা, বিভিন্ন মাতৃকাদেবীর পূজা, গণেশ, শিব ও শিবলিঙ্গ পূজা, লৌকিক পূজার্চনা, যেমন-পঞ্চানন্দ, গ্রামদেবতা, মাকালঠাকুর, ইতুপূজা, জগন্নাথপূজা আজো দারুণভাবে জনপ্রিয়। এগুলো বাঙালিরা দ্রাবিড়ভাষীদের নিকট থেকে পেয়েছে, এবং এঁদের উদ্দেশে পূজার্চনা পদ্ধতি, শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদি, উপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদির ব্রাহ্মণ্য প্রলেপ লাগিয়ে বাঙালি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব পূজা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আহমদ শরীফের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেন:

> আর্যরা খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন তারা ছিল যাযাবর। স্থায়ী বাসিন্দা না হলে আত্মপ্রসার, সম্পদ সঞ্চয়, ঘরবাড়ি, নগরসভ্যতা নির্মাণ অথবা, স্থায়ী কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ সম্ভব হয় না। তাই যাযাবর আর্যরা অনুপ্রবেশের প্রথম দিকে ছিল নগরসভ্যতার শত্রু, তাদের কোনো সভ্যতা ছিল না। তারা প্রাগার্য নগরসভ্যতা ও পুর ধ্বংস করত বলেই আর্য দস্যুপতি ইন্দ্রের আরেক নাম পুরন্দর। ঋগ্বেদের অধিকাংশই ভারতে রচিত। তাই তাতে রাত্রি, দেবী, সরস্বতী, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি স্থানীয় নারী-পুরুষ দেবতাও ঠাঁই পেয়েছেন। রাক্ষস, দস্যু, দাস, দৈত্য, অসুর, পনি, দানব, যক্ষ, বানর, কুকুর, হনুমান, নাগ প্রভৃতি টোটেম-টাবু নামের [পরবর্তীকালে তাৎপর্যহীন অবজ্ঞেয় নামের] ভব্য গোত্রগুলোর আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা, কৃৎ-কৌশল প্রভৃতি সবকিছুই তাদের গ্রহণ বরণ করতে হয় সভ্যদের শাসক হওয়ার প্রয়োজনে। স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে ও গৃহ বা সভা-সজ্জায় ছিল দানবেরা পটু, ময়দানবের বৃত্তান্ত এক্ষেত্রে স্মতর্ব্য। বানর বালি-সুগ্রীবের পিতা সুষেণ ছিলেন শল্যচিকিৎসক। শুক, নারদ, ব্যাস, ভীষ্ম প্রমুখ মনীষী ছিলেন অনার্য মানুষ। কৃষিজীবী ছিলেন এদেশের অধিকাংশ মানুষ। জনক দরবারে হরধনু ভাঙ্গা, সীতালাভ, রামের পদস্পর্শে অহল্যার জেগে ওঠা প্রভৃতি রূপককাহিনী এ সূত্রে স্মরণীয়। লিপিবিদ্যাও সম্ভবত প্রাগার্য আবিষ্কার। মহাভারতের কবি জেলেনীপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—এ অনুমানের উৎস হতে পারেন।[২]

উপরিল্লিখিত মনীষীগণ ও তাঁদের কৃতি ও কীর্তি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় দর্শন প্রাগার্য ভারতকে মহিমান্বিত করেছে। এঁরা অধিকাংশই দ্রাবিড়ভাষী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বা পেশাজীবী শ্রেণী থেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নত ছিলেন বলেই তাঁদের মধ্যে মূর্তিনির্মাণ, পূজাপার্বণ ও ধর্মীয় দর্শনের জগৎ তৈরি হয়েছিল। অতুল সুর তাঁর *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য* গ্রন্থে বলেন:

> মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, শিব ও লিঙ্গপূজা,

---

[২] আহমদ শরীফ, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা* (ঢাকা: ইউপি এল, ১৯৮৭), পৃ. ১৪-১৫।

কুমারীপূজা, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষপূজা, সর্পপূজা, টটেমের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, দেবদেবীর বাহনের কল্পনা, জন্তুপূজা, গ্রাম্য নদীবৃক্ষ-অরণ্য ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস, বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম-কর্ম, নব পত্রিকার পূজা, শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেটু, চড়ক, গাজন, মনসা, শীতলা, কালী, করালী, ছিন্নমস্তা, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ও লিখন প্রণালী, দশাবতারবাদ প্রভৃতি প্রাগার্যদের কাছ থেকেই নেওয়া।[৩]

এসব প্রাগার্য পূজাপার্বণের অধিকাংশই যে দ্রাবিড়ভাষীদের দ্বারা এদেশে আনিত হয়েছিল তা এঁদের আলোচনা থেকে ধারণা করা যায়, এবং আলোচ্য প্রবন্ধ তা প্রমাণ করবে। কারণ প্রাগার্য অস্ট্রিকরা দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজাপার্বণ করত না। তবে অস্ট্রিকদের বিভিন্ন আচার-সংস্কার-বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি বাঙালি জীবনে গৃহীত হয়েছে। বাঙালির ধর্মীয় দর্শনে যে দশাবতারবাদ তা ভূমধ্যসাগরীর দ্রাবিড়দেরই দান।

আহমদ শরীফ আরো বলেন, "শিব, উমা, কৃষ্ণ, বাসুদেব, রাম প্রভৃতি অনার্য নাম। রাম ছিলেন নবদূর্বাদল শ্যাম, কৃষ্ণ ছিলেন নবঘনশ্যাম, শিব ও কালী, চণ্ড ও চণ্ডী কালো, আর্য প্রভাবে কালী শেষে হয়েছেন গৌরী—গৌরবর্ণা, যেমন রাধাও হয়েছেন গৌরী। অতএব শিব, কালী, রাম কৃষ্ণ—এঁরা আর্য নন।"[৪] এছাড়াও জন্মান্তরবাদ, পশুপাখি, নারী ও বৃক্ষপূজা, মন্দির উপাসনা, প্রতিমা বা মূর্তি পূজা, স্বর্গ-নরক, ভূত-প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরতত্ত্ব, পরমা প্রকৃতিতত্ত্ব ও লিঙ্গপূজা, গণপতিপূজা, চণ্ডী, মনসা, ওলা, শীতলা, বৎসলা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল, ঋতুপূজা, ছটপরব, ষষ্ঠীপূজা, দুর্গাপূজা বা দশমহাবিদ্যাসম্পন্না দশহরাপূজা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, প্রভৃতি সব ধারণা ও পৌত্তলিকতা আর্যপূর্ব যুগের ভারতবাসীর দান।[৫] উপর্যুক্ত দেবদেবী, পূজাপার্বণ, ধর্মীয় দর্শন প্রাগার্য ভারতবর্ষের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ভোট-বর্মী ভাষাভাষীদের থেকে উদ্ভূত।

### ৩. হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো-সিন্ধু-দ্রাবিড়ীয় ও বাঙালির সভ্যতা : একসূত্রে গাঁথা

প্রাগৈতিহাসিক হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো-চনহুদড়ো প্রভৃতি স্থান থেকে যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে বাংলার অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণের তীরে, রাঢ় অঞ্চলে, চন্দ্রকেতুগড়ে, পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, মহাস্থানগড়ে, নরসিংদীর ওয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রবল মিল পরিদৃশ্যমান। এসব কারণে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের আগেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পূর্বভারত তথা বাংলাদেশ পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া মহেঞ্জোদাড়ো, সিন্ধুনগরের সাথে মহাস্থানগড়, তাম্রলিপ্তি ও ওয়ারী বটেশ্বরের নৌবাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলেও ধারণা করা যায়। এ বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায় ড. আহমদ শরীফের *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা* গ্রন্থে। তিনি বলেন, "মূলে লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলাঞ্চলের হামীয়-সামীয়-ফিনিশীয়-মাইসেরীয়-সুমেরীয় গোত্রজ দ্রাবিড়-ভেড্ডিডরাই টোটেম-টাবু ও যাদুবিশ্বাস এবং সম্ভবত সর্বেশ্বরবাদ বা এ্যানিমিজম সঙ্গে নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। যারা উপকূল বেয়ে পরে হাঁটাপথে দক্ষিণভারতে (এখনকার তামিল-তেলুগু-কান্নাড়ি-মালায়ালম প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষী যাদের বংশধর) আসে, তারাই সম্ভবত নবী-অবতারবাদ এদেশে চালু করে। ... হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো প্রাপ্ত সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনের

---

[৩] অতুল সুর, *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯৮), পৃ. ১২-১৩।

[৪] আহমদ শরীফ, পৃ. ১৬।

[৫] ভারত সরকার প্রকাশিত, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*।

মধ্যে বৃষ, শাকম্ভরী ও শিবকল্প মূর্তি মিলেছে।"[৫] এ লতা-প্রসূতি নারী ও ওই পুরুষ মূর্তি পরবর্তীকালের চণ্ড-চণ্ডী বা শিব-উমা বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এ সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার চার হাজার বছরের আগেকার সভ্যতার। অতএব দ্রাবিড় ভেড্ডিডসভ্যতা ও সিন্ধুসভ্যতা সমকালীন বলে মেনে নেওয়া চলে।"[৬]

একটা সময় ছিল যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্মে যা-কিছু প্রাক্-বৈদিক দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক অবদান তার সবটাই নগণ্য ও কুসংস্কারমূলক। বর্তমানে সে-ধারণা আমূল পাল্টে গেছে। হিন্দুধর্মের উপর অস্ট্রিক-দ্রাবিড় উপাদানসমূহ, যেমন—দেবদেবী, পূজাপার্বণরীতি, পূজাচার-সংস্কার ইত্যাদি স্বীকৃতি পেয়েছে। মন্দির নির্মাণ ও তার সংরক্ষণ, সাকার দেবতার কল্পনা, মাতৃকাদেবীপূজা, উর্বরতামূলক বিশ্বাস ও পূজা, শিব, শিবলিঙ্গপূজা প্রভৃতি দ্রাবিড় উৎস থেকে বাঙালি সংস্কৃতিতে এসে ক্রমে ক্রমে সেগুলো বাঙালির দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনের একান্ত আপন হয়ে উঠেছে। বহুকাল আগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন 'উমা' শব্দটি সংস্কৃত ভাষার নয়। এর উৎস মা, যে নামের পশ্চাতে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগর এলাকার মানুষেরা মাতৃদেবীর পূজা করত। তিনি লিখেছেন:

> The patriarchal social organisation of the Aryans presented a contrast to the matriarchal ones of the Dravidians. The great Mother Goddess of a matriarchal society who was brought into India by the Dravidians from the Asia Minor and the Eastern Mediterranean Islands, was also conceived as a powerful force which was identical with nature itself.[7]

### ৬. বাঙালি ও আদিবাসীদের দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনের সাদৃশ্য

বাঙালির ঘরে-বাইরে, গাছতলায়, চৌরাস্তার মোড়ে, ঝোঁপে-জঙ্গলে যেসব পূজা হয় তার সঙ্গে দক্ষিণভারতের দ্রাবিড়ভাষী আদিবাসী ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের দেবদেবীর মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দ্রাবিড়ভাষীদের অজস্র দেবদেবীর পূজাপার্বণের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত পূজাপার্বণ, আচার-সংস্কারগুলোর বৈশিষ্ট্যের যে প্রবল মিল আছে তা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি লিখেছেন:

> দক্ষিণভারতের উপজাতীয় দেবীদের সংখ্যাও অজস্র, এবং অধিকাংশেরই নামের শেষে মাতৃত্ববাচক আম্মা শব্দটি যুক্ত। এইসব দেবীরা কোন বৃহৎ প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক নন, ছোটখাট গ্রাম্য ব্যাপার নিয়ে এঁদের কারবার, যেমন কৃষিকাজ, পশুরোগ, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি। একথা উত্তরভারতের ক্ষেত্রেও সত্য। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল দেবীরা প্রায় সকলেই পশুবলি সহকারে পূজিতা হন। তৃতীয়তঃ পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ নন, নীচ জাতীয়। চতুর্থতঃ যেটা বিশেষ করে দক্ষিণভারতেরই ব্যাপার, তিন-চার মাইল অন্তর অন্তর একই দেবীর নাম বদলায়। পঞ্চমতঃ এঁরা অবিমিশ্র হিতকারী নন অবিমিশ্র সর্বনাশীও নন। ষষ্ঠতঃ এদের সুনির্দিষ্ট মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম, সাধারণতঃ কোন স্থানে, গাছের তলায়, চৌরাস্তার মোড়ে, এঁদের পূজা হয়। কোন পাকাপাকি মূর্তিও এদের নেই, তবে অনেক সময় কাঠ বা মাটির কাল্পনিক

---

[৬] আহমদ শরীফ, পৃ. ২৬।

[৭] H.C. Roy Choudhury, "Studies in Indian Antiquities" in *Modern Review,* 1924, p. 624. *Journal of the Asiatic Society,* 1959, I. pp.107-08.

মূর্তি গড়া হয়, কখনও আকারহীন পাথর দিয়েই দেবতার কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়।[৮]

উপরিউক্ত দক্ষিণভারতীয় উপজাতি বা আদিবাসীদের ধর্মীয় দেবীর সম্বোধনসূচক 'আম্মা' শব্দটিই বাংলায় মা-তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন-সর্পদেবী 'মঞ্চাম্মা' বাংলায় মনসা মা, 'উম্মা' রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় উমা ইত্যাদি হয়েছে। বাঙালির ও দ্রাবিড়দের দেবদেবীর তুলনা ও সাদৃশ্য বিচার করে এবং যথাসম্ভব ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হবে— বাঙালির ধর্মীয় দেবদেবীর পূজাপার্বণে ও তাদের দর্শনে দ্রাবিড় দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব কতটা গভীরে প্রোথিত রয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ দেখেছেন যে, 'পূজা'[৯] ও পূজার প্রধান উপকরণ 'পুষ্প'[১০] শব্দ দুটি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। দ্রাবিড় শব্দ পুজু অর্থ ফুল, তেলুগুতে প-উ। দ্রাবিড়দের দেবদেবী আর্যদের দ্বারা আর্যীকৃত হয়েছে এবং সাথে সাথে পূজা ও পুষ্প শব্দও তাদের ভাষায় আত্তীকৃত হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকভাষী জাতিগোষ্ঠীগুলোর চেয়ে বেশি সভ্য ছিল। অট্টালিকা, পোতাশ্রয়, নাগরিক সভ্যতা তারাই নির্মাণ করেছিল। হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ তাদের কাছ থেকে গৃহীত। শিব, বিষ্ণু, উমা ও শ্রীর কল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। যোগ সাধনার গূঢ়-মূল তত্ত্বও দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রথমে উদ্ভূত হয় বলে সুনীতি বাবু মনে করেন।[১১] তাছাড়া মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, লোথাল, কালীবঙ্গান, চন্হুদড়োর সভ্যতা যে দ্রাবিড়দের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, দেবদেবীর মূর্তি ও শিল্পকলার নিদর্শন থেকে তা স্বীকৃতি পেয়েছে।[১২]

## ৫. বাঙালির দেবদেবী ও ধর্মীয় দর্শনে দ্রাবিড় প্রভাব

যে সব দেবদেবী ও পূজাপার্বণ দ্রাবিড়দের দ্বারা বাঙালির সংস্কৃতিতে স্থায়ী আসন পেয়েছে, সেগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

*i) পাহাড়-পর্বত, নদী-বৃক্ষ-মানবেতর প্রাণীর দেবতাজ্ঞানে পূজা*

দ্রাবিড় জাতিগুলোর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পাহাড়-পর্বত-নদী-বৃক্ষ ও মানবেতর প্রাণীতে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বাস ও তাঁদের পূজার্চনা করা। দ্রাবিড়সভ্যতা অরণ্যে, পাহাড়-পর্বতে, নদী-বৃক্ষের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল বলে দ্রাবিড়দের ধর্মকর্ম ও দর্শন এঁদের ঘিরেই গড়ে উঠেছে। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই মানবেতর প্রাণী, পাহাড়-পর্বত-নদী-বৃক্ষপূজা দ্রাবিড় সংস্কৃতির দর্শনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। বলা চলে, দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রভাবে শুধু বাঙালির সংস্কৃতি নয়, গোটা ভারতীয় সংস্কৃতিতে ক্রমে ক্রমে জীবজন্তু, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতি নবরূপ পরিগ্রহ করেছে।[১৩] দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতি ও

---

[৮] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস* (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০০), পৃ. ২৩।

[৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত সংস্কৃতি* (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪০৯), পৃ.১১।

[১০] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব (কলকাতা : দে'জ পবালিশিং, ২০০১), পৃ. ৫৬।

[১১] তদেব, পৃ. ১০।

[১২] অতুল সুর, *সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা* (কলকাতা : উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৯০), পৃ. ৭৬-৮৫।

[১৩] "Prevedic Elements in Indian Thought" in S. Radhakrisnan (ed.) *History of Philosophy: Eastern and Western,* উদ্ধৃত মোঃ মতিউর রহমান, "ভারতীয় দর্শনের বিকাশে প্রাক-বৈদিক ও বৈদিক সাহিত্যের প্রভাব" *সাহিত্য পত্রিকা*, একচল্লিশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪০৫, বাংলা বিভাগ, ঢা.বি., ঢাকা, পৃ. ১৬৩-২১২।

ধর্মীয় দর্শনের প্রভাবেই বাঙালি তথা ভারতীয় হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি ও জীবজন্তুকে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন হিসেবে এবং তাদের ধ্বজা প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যেমন-গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন গরুড়, ব্রহ্মার বাহন হংস ইত্যাদি।

যার প্রবাহের ক্ষমতা আছে, যার নিজের চলার ও অপরকে চালাবার ক্ষমতা আছে তাদের প্রাণ আছে—এই দর্শন দ্রাবিড়দের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল, যেমন-বাতাস বহে, নদী বহে, বৃক্ষ বড় হয়, সুতরাং এদের সকলের প্রাণ আছে। আবার মানুষের সাথে যার কোনো সম্বন্ধ আছে, যাঁরা মানুষের অনিষ্ট করতে পারে ও মঙ্গল করতে পারে তাদের সকলের প্রাণ আছে—অনার্য প্রাচীন মানুষেরা এই বিশ্বাস পোষণ করত। অর্থাৎ বাঙালির প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা এ ধরনের বস্তুতে প্রাণের কল্পনা করত।[১৪]

বন মানুষের যেমন উপকারে আসে, তেমনি তা একসময় মানুষের প্রচণ্ড ভয়ের কারণ ছিল। হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ পার্বত্য বনমধ্যে তাদের দেবদেবী জাগ্রত ছিল। বাংলায় আজো অশ্বত্থ-বটবৃক্ষে বাঙালিরা পূজা দেয়, নানান দ্রব্যাদি উৎসর্গ করে, এমন-কি লক্ষ্মী-নারায়ণ বিবেচনায় বট-অশ্বত্থের বিয়েও হয়। মোটকথা, বৃক্ষপূজা বাংলায় এখনো প্রচলিত। বাঙালির গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে বাস্তুপূজায় এখনো ডাল পুঁতে পূজা হয়। নমঃশূদ্রসহ অনেক জাতির মধ্যে তা এখনো সশ্রদ্ধায় পূজিত। অরণ্যষষ্ঠীতেও গাছে সিঁদুর মাখিয়ে পূজা হয়; গাছের কাণ্ডে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। এখনো সুন্দরবনের কাঠুরিয়ারা, মধুসংগ্রহকারী ময়ালগণ বনদেবতা খুব মানে। এখনো তারা নিজেদের অনিষ্ট হতে রক্ষার নিমিত্তে একজন দরবেশকে আগে জঙ্গলে পাঠায়—এরকম অনেক বিশ্বাসই বাঙালির মনে সশ্রদ্ধায় অধিষ্ঠিত।[১৫] এগুলো দ্রাবিড় প্রভাবেরই রেশ। এভাবেই বিপদ থেকে, অনিষ্টের হাত থেকে নিজেদের রক্ষায়, জীবনের রোগশোক, জরাব্যাধি থেকে মুক্তি ও জীবনের কল্যাণ কামনায় মানবেতর প্রাণী, বৃক্ষ ও জীবজন্তুর পূজায় শুধু নয়, নদ-নদী ও সমুদ্র থেকে অধিক মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যে ও সলিল সমাধি থেকে জীবন রক্ষার উদ্দেশে জলদেবতাপূজা, গঙ্গাপূজা-নদীপূজার সৃষ্টি হয়েছে। এবং ক্রমে ক্রমে সমুদ্র ও নদনদী তীরবর্তী স্থানসমূহ হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র ও পূণ্যভূমিতে পরিণতি ঘটেছে। এগুলো দ্রাবিড় সংস্কৃতিরই দান।[১৬]

*ii) শিব, শিবলিঙ্গ, চড়ক ও গাজন উৎসব*

'শিব' শব্দটা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, যার অর্থ রক্তবর্ণ। ঋগ্বেদে শিব নেই আছেন 'রুদ্র'।[১৭] সংস্কৃতে রুদ্র শব্দের অর্থও রক্তবর্ণ। ঋগ্বেদের রুদ্র ভীতির, কল্যাণের নয়।[১৮] এই রুদ্র ঝড়ঝঞ্ঝা, অশনি, অগ্নি, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিপর্যয় ও দুর্বিপাকের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্রাবিড় শিবও একই ধরনের রূপে বর্তমান। *শতপথ ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ* ও *বাজসনেয়ী সংহিতায়* রুদ্রের যে সকল নাম-শর্ব, ভব, উগ্র, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান ইত্যাদি পাওয়া যায় সেগুলো দ্রাবিড় শিবেরই নামান্তর। এসব কারণে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন বৈদিক ধর্মে রুদ্রের আরাধনা দ্রাবিড়ীয় শিব থেকে গৃহীত হয়েছিল।[১৯] এর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, শৈবধর্মের কয়েকটি লৌকিক দিক নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বরাবর জনপ্রিয়তা পেয়ে এসেছে। নিম্নবর্গের মানুষ, কৃষিজীবী ও আদিবাসী-উপজাতি

---

[১৪] *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*, খণ্ড ৩ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০), পৃ. ২৫৩-৫৪।

[১৫] তদেব, পৃ. ২৫৪।

[১৬] মো মতিউর রহমান, "ভারতীয় দর্শনের বিকাশে প্রাক-বৈদিক ও বৈদিক সাহিত্যের প্রভাব" পৃ. ১৬৩-২১২।

[১৭] ঋগ্বেদ ১,১১৪,৮;২,৩৩,৯-১৩।

[১৮] R.G. Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems*, 1913, p. 103.

[১৯] অতুল সুর, *সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

সম্প্রদায়ের মানুষের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, যেগুলোর অনেকটাই তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বর্তমান, তা শৈবধর্মে যতটা প্রশ্রয় পেয়েছে, অন্যত্র ততটা নয়। শৈবধর্মকে বেদান্তমুখী করা হলেও তন্ত্র ও সাংখ্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। যার ফলে শৈব ও শাক্তধর্ম এমনভাবে মিশে গেছে, শৈব-শাক্তধর্ম এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত যে উভয়ের পার্থক্য করাটাই দুষ্কর হয়ে ওঠে।[২০]

দ্রাবিড় সভ্যতার অন্যতম পাদপীঠ হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতায় প্রাপ্ত সীলের যে মূর্তি তা শিবের মূর্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন স্যার জন মার্শাল[২১] ও এম.এস. ভাট।[২২] তাছাড়া হরপ্পা সভ্যতা জুড়ে অজস্র লিঙ্গ ও যোনিমূর্তি শিবমূর্তিরই সমর্থক। উত্তরকালে ভারতীয় তথা বাংলায় লিঙ্গ বলতে প্রধানত শিবলিঙ্গই বোঝায়। পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের মুদ্রায়। বিশেষ করে উজ্জয়িনী থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায় দণ্ডকমণ্ডলুযুক্ত ত্রিমুখ শিবের চিত্র বর্তমান। তাছাড়া তক্ষশিলায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জসিলে, মউএস ও গন্ডোফারেসের তাম্রমুদ্রায়, ঔদুম্বরদের তাম্রমুদ্রায়, কুষাণ, কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের মুদ্রায় শিবমূর্তি অঙ্কিত আছে।[২৩] দ্রাবিড় দেশে খ্রিস্ট জন্মের বহু আগে থেকেই লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে দক্ষিণভারতের দ্রাবিড় ভূমিতে শৈবধর্ম প্রচারিত হয়। লকুলীশ এই ধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার করেন। কর্ণাটকের সির তালুকের অন্তর্গত হেমাবতী গ্রামে প্রাপ্ত ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ থেকে জানা যায়, ঐ স্থানে লকুলিশ মুনিনাথ চিল্লুকরূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি লকুলিশ মত পুনরুজ্জীবিত করেন। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি বংশীয় নৃপতিগণ ও সে-দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ অনেক শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২৪] দ্রাবিড় জনসাধারণ ব্যাপকভাবে শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়। তামিল শৈব সাহিত্যে *পেরিয়াপুরাণম* নামক একটি গ্রন্থ আছে যাতে ৬৩ জন শৈব সাধকের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর মানুষ, যেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[২৫] দক্ষিণভারত বৈদেশিক আক্রমণ থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল বলে সেখানে শৈবধর্ম বিস্তারলাভে সমর্থ হয়েছিল।[২৭] এভাবে দ্রাবিড় ভাষাভাষী প্রদেশগুলোতে শৈবধর্মের স্রোত জনগণকে নবধারায় দীক্ষিত করল। লিঙ্গপূজার সাথে শিব পূজা মিশে একাকার হয়ে গেল। আর তারপর দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের দ্বারা বাংলাদেশের সর্বত্র আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন:

> দক্ষিণভারত হতে দলে দলে শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া বঙ্গদেশে ও অন্যত্র শৈবধর্ম প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহারই ফলে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে বৌদ্ধ প্রপীড়ক বঙ্গরাজ শশাঙ্ক শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময় মহারাজ হর্ষ শৈব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড় প্রভাবে ক্রমশ বাংলার শৈব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশে লিঙ্গপূজা ও শিবারাধনার ধুম চলিল। যাঁহারা লিঙ্গপূজার নিন্দা করিতেন তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রাদি রচিত হইল। এই সময়ে নানাদিক হইতে লিঙ্গের নানারূপ ব্যাখ্যারও অভাব হইল না।

*শিব লিঙ্গ পূজা* শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবলিঙ্গের মাথায় জল বা দুধ ঢালার রীতি আদিম যৌনপ্রতীকপূজারই প্রবহমান ধারা। প্রাক-বৈদিক হরপ্পা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের নিদর্শনরূপে এখনো বর্তমান রয়েছে মাতৃকামূর্তি, লিঙ্গ ও যোনিপূজা। লিঙ্গের যেসব প্রতিরূপ বাংলাদেশে পাওয়া গেছে তা দাক্ষিণাত্যেও আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা আশ্চর্য ও বিচিত্র ব্যাপার এই যে, এক প্রকার লিঙ্গ উপাসনা,

---

[২০] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ১৯৬।

[২১] J. Marshall, *Mohenjodaro and the Indus Civilization,* 1931 (I), pp.52-56.

[২২] M.S. Vat, *Excavations at Harappa*. 1950, pp.129-130.

[২৩] J.N. Benerjea, *Development of Hindu Incography*. 1956,p. 117 ff.

[২৪] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ২০৪।

[২৫] তদেব, পৃ. ২০৫।

[২৭] J. Marshall, *Mohenjodaro and the Indus Civilization,* 1931 (I), pp.52-56.

যথাবাণলিঙ্গের উপাসনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নিবদ্ধ কিংবদন্তি অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের সাথেই সংশ্লিষ্ট।[২৭] লিঙ্গ ও যোনির উপস্থিতি উর্বরতামূলক যাদুবিশ্বাসকেন্দ্রিক ধর্মের ইঙ্গিতবাহী যেগুলো যথাক্রমে পুরুষ দেবতা ও মাতৃকা দেবীর প্রতীক। এগুলো থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এগুলো পরবর্তীকালের সুবিস্তৃত শিব ও শক্তির ধারণার পূর্বাভাস। সুপ্রাচীনকালে দ্রাবিড়গণ যখন শক্তি ও লিঙ্গপূজা করত, তখন বাংলাদেশাঞ্চলে পূজা অনুষ্ঠিত হতো না। পঞ্চম শতকের পূর্বে শক্তিপূজা বঙ্গদেশে পূজিত হতো না। দ্রাবিড়দের দ্বারা বাংলায় এই পূজার বিস্তার লাভ হয়েছে।[২৮]

শিবকে ঘিরে বাংলায় যেসব ধর্মানুষ্ঠান বা উৎসব হয় উত্তরবঙ্গে তার নাম গম্ভীরা, রাঢ় বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে এর নাম গাজন, আর পূর্ববঙ্গের অনেক এলাকায় এঁকে ঘিরে উৎসবের নাম চড়ক। এছাড়া কোনো কোনো এলাকার নীলপূজা, সাহীযাত্রা প্রভৃতি নামে পরিচিত। তা ছাড়াও রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ বা আদিবাসীদের বিশেষ করে ওরাওঁ, ভুঁইয়া, পাহাড়ি ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে যে-গাজন হয় তার ক্রিয়াকলাপ, তাৎপর্য, কামনা-বাসনার সঙ্গে হিন্দু বাঙালির গাজনের মৌলিক সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। গাজন উৎসবে বাণফোঁড়া, চড়ক, আগুনঝাঁপ, কাটাঝাঁপ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলো বিচিত্র ও লোমহর্ষক। শিবকে ঘিরে দাক্ষিণাত্যে এখনো বাংলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আচার-সংস্কার বিদ্যমান রয়েছে তা পল্লব সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায়:

> ... বাণফোঁড়া অবস্থায় খুঁটির গায়ে-লাগানো চাকার সঙ্গে ঘুর্ণিপাক খাওয়ার অনুষ্ঠান দাক্ষিণাতে ও একসময় প্রচলিত ছিল — এখনো খুব অজ পাড়াগাঁয়ে অল্পস্বল্প এই চক্রাবর্তনের মাধ্যমে ধর্মাচার পালনের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, সেখানেও শিব-সংস্রব রয়েছে এই ধর্মধারার সঙ্গে। বাংলার 'চড়ক' 'গাজন' এবং তামিলনাড়ুর (এই) 'চেণ্ডুল' ভাবরূপে পরস্পরের সদৃশ হলেও, এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ডি. ডি. কোশাম্বী এই দক্ষিণী-চড়ক (চেণ্ডুল বলে এখনি যাকে উল্লেখ করা হলো) অনুষ্ঠানটিকে একটি গবেষণা নিবন্ধে 'ফসিলাইজ' রিচুয়্যাল বলে যে অভিহিত করেছেন, তার যথার্থ প্রশ্নাতীত। স্মরণাতীত আদিমকালের স্মৃতি অবশেষই এই সব অভিচারমূলক প্রথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে।[২৯]

মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জে যে গম্ভীরা উৎসব ও আলকাপ গানের প্রচলন রয়েছে তা শিবকে ঘিরে চড়ক-গাজনেরই বিবর্তিত রূপমাত্র।

*iii) মাতৃকা পূজা* : শিব ও দুর্গার সহায়ক শক্তিরূপে অসুর বধের জন্য রণরঙ্গিণী মূর্তিতে যাঁরা দেবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরাই মাতৃকা নামে খ্যাত। মাতৃকাগণ মূলত অনার্য দেবী হিসেবে উদ্ভূত। পরবর্তীকালে তাঁরা বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থাবলিতে দেবতার শক্তি বিশেষ করে শিব, স্কন্দ আর দুর্গার সহায়কশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। কিন্তু এই মাতৃকা দেবীগণের সংখ্যা নিয়ে *বৃহৎসংহিতায়*, বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থাবলি যেমন—*মার্কণ্ডেয়পুরাণ*, *বরাহপুরাণ*, *মৎস্যপুরাণ*, *কূর্মপুরাণ*, *স্কন্দপুরাণ*, *ভবিষ্যপুরাণ* প্রভৃতিতে শিলালিপিতে, গুহাচিত্রে, উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকে, *মহাভারতে* অন্তহীন মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। মাতৃকাদেবীর অনির্দিষ্ট সংখ্যা প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সাত বা আটজন দেবতার শক্তির বাঁধাধরা সংখ্যার পাশাপাশি অন্যান্য দেবতারও শক্তি বা রূপ সম্বন্ধে একটি

---

[২৭] অতুল সুর, *সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, পৃ. ৯৯।

[২৮] *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৫৭।

[২৯] পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা* (কলকাতা : পুস্তক বিপণী ২০০১), পৃ. ২২৫।

বিশ্বাস বর্তমান ছিল।[৩০] তবে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই যে সপ্তমাতৃকার জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ছিল তা তাঁদের প্রাপ্তমূর্তি-সাহিত্য-শিলা-তাম্রলেখের সাক্ষ্য অনুসারে প্রমাণিত। বিভিন্ন পুরাণ ও মহাভারতে কথিত শতাধিক মাতৃকার মধ্যে অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা সপ্তমাতৃকা হলেন: ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী আর চামুণ্ডা। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে সুনির্দিষ্টভাবে মাতৃকামূর্তি ও তাঁদের পূজার সময়কাল চিহ্নিত করা না গেলেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক কালের পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলো মাতৃকা মূর্তির নিদর্শন। এঁরা অনার্য দ্রাবিড়ভাষীদের দ্বারা পূজিত হতেন। কালক্রমে শাক্তধর্মের উদ্ভব ও প্রসারের সাথে সাথে এঁদের পূজা ব্যাপ্তিলাভ করেছে বর্ণহিন্দুর ধর্মে ও সমাজে। প্রাচীন ভারতে মাতৃকা পূজার ব্যাপকতার উল্লেখ পাওয়া যায় নাট্যকার ভাস ও শূদ্রকের লেখায়।[৩১] সিন্ধু ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা খননে প্রাপ্ত মাতৃকাদেবী প্রসঙ্গে জন মার্শাল যে মন্তব্য করেন তা অত্যন্ত সঠিক ও যৌক্তিক। তিনি বলেন, পরবর্তীকালে মাতৃকাপূজার শাক্ত পর্যায়ে দেবী সর্বশক্তিমতী প্রকৃতি বা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং পুরুষের সহযোগে জগদম্বা বা জগন্মাতারূপে তিনি বিশ্বচরাচর ও দেবগণকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোচ্চরূপে তিনি মহাদেবী, শিবের প্রেয়সী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্রষ্টা।[৩২] এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগর উপকূলে অজস্র মাতৃকামূর্তির প্রাপ্তিও এই মন্তব্যকেই সমর্থন করে। সুদূর প্রাগৈতিহাসিককালে মাতৃত্বের প্রাধান্য এত বেশি ছিল যে, তাঁরা মাতৃমূর্তিকে সর্বোচ্চ দেবীজ্ঞানে পূজা করত। একসময় মাতৃদেবীই ছিল ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। Starbuk মাতৃদেবী সম্পর্কে লিখেছেন:

> Female deities have often enjoyed the highest place among the gods. This depends upon the nature of the social organization and the respect in which women are held. Clan life in which the mother is the head of the group is likely to lift the mother goddess into a supreme position.[৩৩]

যাহোক, এবার দেখার চেষ্টা করা যাক, এই মাতৃকা দেবী ও তাঁর পূজা বাংলাদেশে কোথা থেকে, কিভাবে এসেছে, এবং বাঙালির স্বতন্ত্র দেবী হিসাবে পূজিত হয়েছে; তার স্বরূপ ও দাক্ষিণাত্যের মাতৃকার স্বরূপের মধ্যে কতটুকু সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য আছে, সে বিষয়টি।

ভারতবর্ষে মনুর সময়ে মেয়েরা অত্যন্ত যত্নে লালিত হতো বলে কথিত হয়। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেক দিক দিয়েই বড় ছিল। এখনো দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের সমাজে মায়েদের প্রাধান্য বেশি। বাংলাদেশের সমাজেও যে মাতৃপ্রাধান্য ছিল তা অস্ট্রিকভাষী খাসিয়া ও বোরোভাষী গারোদের মধ্যে তার প্রমাণ আছে। এখনো সান্তাল, ওরাওঁ, পাহাড়িদের সমাজব্যবস্থা পিতৃপ্রাধান্য হলেও তাদের সমাজে মাতৃত্বের মূল্য অনেক। মা এখনো সংসারের অনেক দায়দায়িত্ব নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে। উত্তরবঙ্গের সমাজেও এখনো মাতৃতান্ত্রিকতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচর্য বলেন, "আদিম যুগের জীবনদায়িনী মাতার ভূমিকা শস্য ও উদ্ভিদজগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিই মাতৃদেবীরূপে কল্পিতা হয়েছেন। কালক্রমে পিতৃপ্রধান সমাজ প্রতিষ্ঠা হলেও পুরাতন মাতৃদেবীকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হয়নি, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যেখানকার সমাজজীবন

---

[৩০] Jitendranath Banerjee, *The Development of Hindu Iconography*, 2nd (ed.), (Calcutta, 1956), p. 504.

[৩১] D.D. Kosambi, "At the Cross Road", in *Journal of the Royal Asiatic Society* (London, 1960), p.18.

[৩২] John Marshall, *Mohenyodaro and Indus Civilization*, 1931, I, 48 ff.

[33] *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, p. 828.

আজও বহুলাংশে কৃষিভিত্তিক।"[৩৪] সত্যিকার অর্থেই কৃষিভিত্তিক বাঙালির সমাজে মাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না, যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে অতীতের মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। সমাজ অতীতে যখন মাতৃতান্ত্রিক ছিল, তখনই শক্তি মাতৃরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অবশ্য নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, মাতৃশক্তির কল্পনা পৃথিবী-মাতার চিন্তা থেকেই মানুষের মধ্যে এসেছে। ভয়ঙ্কর শক্তিকে বিষধর সাপের সাথে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে। সেজন্য দক্ষিণভারতের এলম্মা মূর্তিকে দেখা যায়, তিনি সাপের মূর্তিতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, দুর্গাম্মারূপে সাপের গর্তের উপর মন্দির তৈরি হয়।[৩৫] বাঙালির শক্তির দেবী দুর্গার এক হাতে তাই দেখা যায় অসুর নিধনে দংশনরত বিষধর সর্প।

দ্রাবিড় সংস্কৃতিতেই মাতৃদেবীর মূর্তিপূজা ও চিন্তা বেশি লক্ষ করা যায়। একইসাথে মাতৃদেবী মানুষের জন্যে কল্যাণময়ী ও ভয়ঙ্করী উভয়রূপেই অধিষ্ঠিত। তাঁর মধ্যে কন্যারূপ, মাতৃরূপ, সংহারীরূপ ইত্যাদির সমন্বয় ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি একদিকে সর্বমঙ্গলা এবং শাকম্ভরী, যিনি শস্য বৃদ্ধি করেন। চামুণ্ডারূপে তিনিই অসুর নিধনকারী। কালীরূপে তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। রজসীরূপে তিনি ভয়ঙ্করী। রক্ত দন্তিকা হিসেবে তিনি রক্তরঞ্জিত দন্তি। পূর্ব বাংলায় মায়ের রূপ দুটি—সিদ্ধেশ্বরী অর্থাৎ পূর্ণ সম্রাজ্ঞী ও বৃদ্ধীশ্বরী অর্থাৎ বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী।[৩৬] ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দির অধিষ্ঠিত। তিনি সেখানে নিয়মিত পূজা পান। আবার এই মা কোমলরূপে দেখা দেন যখন রোগ-শোক মহামারীরূপে দেখা দেয়। তখন তিনি রক্ষাকালী বা ভদ্রাকালী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তাই বহু ধরনের কালীর মূর্তি ও তাঁর পূজার্চনা দেখা যায়। সেখানে কালীর বহুরূপের মধ্যে—রক্ষাকালী, ভদ্রাকালী, পেটকাটিকালী, কাঁচাকালী, শ্মশানকালী, তারাকালী, শ্যামাকালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এঁরা যুগপৎভাবে মানবের ধ্বংস ও কল্যাণদায়িনী শক্তিরূপে পূজিত।

*iv) শক্তিদেবতা* : শাক্তধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সর্বোচ্চ দেবতা একজন নারী, যিনি নানা নামে ও নানারূপে কল্পিতা। প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় রীতিতে নারীদেবী প্রধান দেবতার স্ত্রী বা সহায়ক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। যেমন শিবশক্তি শিবানী এবং তাঁর রূপভেদে পার্বতী, দুর্গা, কালী, চণ্ডী, চামুণ্ডা ইত্যাদি শিবের স্ত্রীরূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু শাক্তধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হলো সকল দেবতাই দেবীর অধীন এবং আজ্ঞাবহ। সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, কালী, উমা, দুর্গা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতাই শাক্তধর্মমতে মহাশক্তি, মহামায়া শক্তিদেবতারূপে প্রসিদ্ধ। শক্তিদেবতার তাৎপর্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতায় তাঁর শক্তি। তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ুর দেবতা, বাহন শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাহার সংহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।"[৩৬]

শক্তিধর্ম কাদের দ্বারা, কোন সময়কালে জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এবং এই ধর্ম কিভাবে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়ে সর্বভারতীয় ধর্ম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল—সে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। শিব বা রুদ্রের শক্তি হিসেবে উমা, পার্বতী, দুর্গা-চণ্ডী ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব বৈদিক যুগে প্রত্যক্ষ হয় না। যজুর্বেদে উমা রুদ্রের ভগ্নি, এবং তাঁর ধ্বংসযজ্ঞের সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখা গেলেও শিবের শক্তি হিসেবে উমা-দুর্গা-পার্বতীরূপে মহাশক্তির আবির্ভাব বৈদিক যুগে ঘটেনি। আর

---

[৩৪] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, পৃ . ৫।

[৩৫] নিগূঢ়ানন্দ, *বিজ্ঞান ও দেবদেবী* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ২১৫।

[৩৬] তদেব, পৃ. ২১৫।

বৈদিক আর্যরাও এঁদের পূজা করতেন না। শাক্তধর্মের মূলে ছিল সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ, যারা কৃষিজীবী, কারিগর ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। এই ধর্মের গুরু ও পুরোহিত ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ। পরবর্তীকালে আর্যধর্মে দ্রাবিড়দের ধর্মীয় বিগ্রহ ও পূজাচার আত্মীকরণের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মেও এগুলো পূজিত হতে শুরু করে। এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণদের বিদ্যা ও কৌশলের কারণে ধর্মে তাঁদের পৌরোহিত্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনার্য দেবদেবীর অনেকেই ব্রাহ্মণসমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে তাঁদের ধর্মের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে মর্যাদার আসন পায়। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী শৈব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা ঐভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।"[৩৭] অনার্য মাতৃদেবীর অনেকেই এভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মে ও সমাজজীবনে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[৩৮]

সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট ও মিশরে প্রাপ্ত মাতৃকা মূর্তিগুলো এবং হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো, সিন্ধুতে প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলো প্রমাণ করে যে নীলনদ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে মাতৃকাপূজা তথা শক্তি উপাসনার ব্যাপকতা ছিল। আর দ্রাবিড় ভাষাভাষীরাই শক্তি উপাসনা করত। দ্রাবিড়ভাষীদের থেকেই গোটা ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে শক্তি দেবতার পূজা ছড়িয়ে পড়ে। তামিল দেশে যুদ্ধ বিজয়ের দেবতা হিসেবে কোররবৈকে বাঙালির দেবী দুর্গার সাথে অভিন্ন মনে করা হয়।[৩৯] তামিলনাড়ুর কানমরশ্বেল্লি কাডুরৈকডবুল, কাডমরশ্বেল্লি প্রভৃতি দেবী অরণ্যবাসী বনদুর্গার সমতুল্য, বাংলার মঙ্গলচণ্ডী ও ঋগ্বেদের সগোত্রীয়। *শিলপ্পাদিকারম্* গ্রন্থে দারুকাসুর ও মহিষাসুর ঘাতিনী দুর্গার বিবরণ আছে। মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপর দণ্ডায়মান দুর্গার মূর্তি দক্ষিণভারতে প্রচুর পাওয়া যায়।[৪০] দুর্গাপূজা ছাড়াও দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কালী-ভদ্রাকালী-মহাকালী শেলাণ্ডি-আম্মন, দ্রৌপদী-আম্মন, মারি-আম্মন, পেশিয়াম্মন, অঙ্কম্মা, বঙ্গারম্মা, মাতঙ্গী প্রভৃতি নামে পূজিত হয়।[৪১] পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিপূজার ব্যাপকতা এখনো বহুল প্রচলিত। কালীমন্দীর, দুর্গাপূজা এদেশের পথে-প্রান্তরে সর্বত্র। উত্তরবঙ্গে কালী বিভিন্ন নামে পূজিত হয়।

*v) উমা* : ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের মতে, 'উমা' শব্দটি দ্রাবিড় বা সমগোত্রীয় ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। যেমন-উমা দ্রাবিড় 'ওম্ম', ব্যাবিলনীয়তে 'উম্ম' বা 'উম্মু' এবং আক্কাডিয়তে 'উম্মি'।[৪২] ভারতীয় সংস্কৃতে 'উ' অর্থ শিব এবং 'মা' অর্থ স্ত্রী, অর্থাৎ উমা শব্দ দ্বারা শিবের স্ত্রী বুঝায়। তবে 'উমা' শব্দটি মূলে সংস্কৃত নয়। অভিধানেও শব্দটির কোনো প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করা হয় নি। এ সম্পর্কে মনগড়া ব্যাখ্যা আছে অনেকের। যেমন শিবায়নকার রামকৃষ্ণ বলেছেন:

'উমা উমা শব্দ হৈল ভূমিষ্ঠের কালে

---

[৩৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব ১ম প্রকাশ ১৩৫৬, দে'জ তৃতীয় সংস্করণ (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১), পৃ. ৪৮১।

[৩৮] Prof. D.C. Sircar (ed.), *The Sakti Cult and Tara,* (Kolkata : Kolkata University, 1967), p.9.

[৩৯] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, ৩য় খণ্ড (কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রা. লি. ১৯৯৭), পৃ. ৩৪৮।

[৪০] তদেব, পৃ. ৩৪৮।

[৪১] তদেব, পৃ. ৩৪৯।

[৪২] তদেব, পৃ. ৩৪৯।

কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে'।[৪৩]

এরকমভাবে নানাজনে নানাভাবে 'উমা' শব্দের ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে ড. জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়[৪৪], Alain Daniolou,[৪৫] রামকমল বিদ্যালঙ্কার,[৪৬] এমন-কি সংস্কৃতপণ্ডিত কালীদাসও নাকি এভাবেই 'উমা' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলো এবং তার পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে প্রাপ্ত নারীদেবীমূর্তিগুলো থেকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক কালেই শক্তি উপাসনার ব্যাপকতা ছিল। এবং গোটা ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে দ্রাবিড়ভাষীদের মাধ্যমেই শক্তির আরাধনা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ব্যাবিলন, ক্রীটদ্বীপে প্রাপ্ত মূর্তিগুলোর সাথে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো-সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলো শুধু না, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, ক্রীট, ব্যাবিলন ইত্যাদির সাথে সিন্ধু রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল—তাও প্রমাণিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের পর্বতবাসিনী 'সিবিলী' দেবীর সাথে উমা হৈমবতীর ভাগবৎ মিলও ঐতিহাসিকগণ লক্ষ করেছেন। এই সিবিলীই পরবর্তীকালে 'কুবিলী' নামে পরিচিত, যার প্রমাণ সিবিলি > কুবিলি > কাইবাল > কাবুল ও বালচি (স্তান) নামের সাক্ষ্যে পাওয়া যাচ্ছে।[৪৭]

*vi) মনসা* : সর্পদেবী মনসার পূজা বাঙালির ঘরে-ঘরে বিশেষভাবে নিম্নবর্গের হিন্দু জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমাদৃত। বাংলায় মনসার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নাম লক্ষণীয়, যেমন—কেতকা, জাঙ্গুলী, পদ্মা, চ্যাংমুড়ি ইত্যাদি। মধ্যযুগের *মনসামঙ্গল* কাব্যগুলোর মধ্যে বাংলার মনসাপূজার উৎস নিহিত। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অবলুপ্তির সময়ে জৈন পদ্মাবতী ও বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারা মনসায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।[৪৮] মনসাপূজা সমগ্র বাংলার হিন্দুর পূজিত দেবী হলেও রাঢ় অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ বর্ণিত বেহুলার মৃত স্বামীসহ ভাসমান ভেলায় যাত্রাপথের পাশে যেসব গ্রামের অবস্থান, যেমন-দুবরাজপুর, নবখণ্ড, জজুটি, বর্ধমান, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, হাসানহাটী, বৈদ্যপুর, নারিকেলডাঙ্গা ইত্যাদি, সেসব গ্রামে মনসার একাধিক 'থান' আছে। মনসা দেবীর পূজা হয় সেজুবৃক্ষের ডাল পুতে গৃহমধ্যে প্রতি বছর আষাঢ়ের দশহরার সময়। মনসা রাঢ় অঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয় পূজা হওয়ার কারণ হলো প্রাচীনকালে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে রাঢ় অঞ্চলে বেশি দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষের বসত গড়ে উঠেছিল। তাই তাদের পূর্বপুরুষের পূজা হিসেবে বঙ্গদেশে মনসাপূজা তাদের মাধ্যমেই ক্রমসম্প্রসারিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলে নাগপঞ্চমীর দিনে 'মঞ্চাম্মা' পূজা প্রচলিত ছিল। তেলুগু ও কানাড়ি ভাষীদের মধ্যে এখনো মঞ্চাম্মা পূজা প্রচলিত। সিজবৃক্ষের এক নাম চেংমুড়, তেলুগু

---

[৪৩] নিগূঢ়ানন্দ, *বিজ্ঞান ও দেবদেবী*, পৃ. ১০৬ এবং পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ১৬২ ; *Modern Review*, 1924, p. 679; Hemchandra Raychaudhury, *Studies in Indian Antiquities*, 1959, pp. 200-04.

[৪৪] নিগূঢ়ানন্দ, তদেব, পৃ. ১০৬।

[৪৫] জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পঞ্চোপাসনা*, (কলকাতা : ফার্মা, কে.এল.এম. ১৯৬০), পৃ. ২২৭।

[৪৬] Alian Danialou, *Hindu Polythesm*, quoted from হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

[৪৭] রামকমল বিদ্যালঙ্কার, *সরল প্রকৃতিবাদ অভিধান*, কলকাতা : দি ব্যানার্জি কোং, ১৯১১), পৃ. ৩৮৬।

[৪৮] পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ১৬২।

ভাষায় তা চেম্মুড় বা জেম্মুড় নামে পরিচিত।[৪৯] বাংলায় মনসাপূজা প্রচলিত হয় সেন-বর্মণ আমলে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, পল্লব সেনগুপ্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণসহ অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, মনসাপূজা দ্রাবিড় সংস্কৃতির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কানাড়িভাষী সেন রাজবংশের আমলে তাঁদের আদিকেন্দ্র রাঢ় দেশে তেলুগু ও কানাড়ি ভাষাভাষী আদিবাসীদের 'মঞ্চাম্মা' নামক পূজা-ই কালক্রমে মনসাপূজা নামে বাংলায় পূজিত, সম্প্রসারিত ও অধিষ্ঠিত হয়।[৫০] দক্ষিণভারত ও বাংলায় মনসাপূজার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হলো মনসাসিজগাছ, দ্রাবিড় বলয়ে যার নাম 'চেম্মুড়'। চেম্মুড় থেকেই মনসার আরেক নাম চ্যাংমুড়ি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 'মনে মঞ্চাম্মা' নামে যে-সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনা এখনো হয়, তার কোনো মূর্তি নেই। এখনো সিজগাছের ডাল পুঁতেই পূজা হয়। মঞ্চাম্মা থেকেই মনসা-মা বা মা-মনসার উদ্ভব হয়েছে বলে ধরা যায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, দেবদাসী প্রথা দক্ষিণভারত থেকে অষ্টম শতাব্দীর পর বাংলাদেশে আমদানি করা হয়, যা বেহুলার ভাসানে বেহুলার নৃত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৫১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চেম্মুড়ু> চ্যাংমুড়ি, মঞ্চাম্মা>মনসা-মা, বেহুলার নৃত্য ≥ দেবদাসীনৃত্য সাক্ষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার মনসা পূজা দক্ষিণভারতীয় দ্রাবিড়ীয়দের ঐতিহ্যাশ্রিত।

*vii) কালী* : শক্তিতন্ত্রের ইতিহাসে কালী এক বিশেষ ধরনের দেবী। তিনি আদ্যাশক্তি (premodial energy) । তিনি একদিকে যেমন ভয়ঙ্করী, সংহারী দেবী, অন্যদিকে তেমনি মঙ্গলদায়িনী শক্তি। সমগ্র বাংলায় কালীপূজা একটি জনপ্রিয় পূজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বাংলায় বিভিন্ন স্থানে কালীমন্দির আছে, যেখানে সারা বছর পূজা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামে কালীপূজার থান আছে। বাংলায় কালীপূজা হিন্দুর অন্যতম প্রিয় পূজা। রোগ-শোক-মহামারী দেখা দিলে, বিপদাপদে রক্ষাকারী হিসেবে তারা কালীমায়ের নিকট মানত করে। ছাগবলি, পশুবলি, বুক চিরে রক্তদান ইত্যাদিও বাংলাদেশে প্রচলিত। এখানেও পূজা হয় কালো পাঠা বলি দিয়ে।[৫২] কালীপূজায় বলির প্রথা মূলত দ্রাবিড়দের। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন, দ্রাবিড়দের মধ্যে কালীপূজায় বলি দেওয়ার প্রথা প্রথম থেকে এখনো প্রচলিত আছে। তিনি আরো বলেন যে, মধ্যযুগের শেষে আরণ্যক জাতির মধ্যদিয়ে বাংলায় কালীপূজা এসেছে। দ্রাবিড়দের মধ্যে কালীপূজায় একসময় নরবলির প্রথা ছিল তারও নাকি প্রমাণ আছে।[৫৩] আদিবাসী ভূঁইয়াদের 'ঠাকুরাণী মাঈ' রক্তপিপাসু দেবী। তাঁর মূর্তি ও বাঙালির কালীমূর্তির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কালীপূজায় যেমন জীব বলি দক্ষিণ ভারতসহ বাংলাদেশে সর্বত্র প্রচলিত, তেমনি কালীপূজা উভয় এলাকায় পূজিত হয় বিভিন্ন নামে। বর্তমানে যে কালভৈরব পূজা হয় তা প্রাচীনকালে হিন্দুদের পূজা ছিল না। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন, দক্ষিণাপথে কনবি কৃষকেরা ভৈরো নামক একটি দ্রাবিড় দেবতার পূজা করে। ভৈরো ত্রিশুল হাতে দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁর আরেক হাতে ঢক্কা, আশেপাশে সাপ তাঁকে বেষ্টন করে থাকে।[৫৪]

---

[৪৯] তরুণদের ভট্টাচার্য, *বাকুঁড়া* (কলকাতা : ফার্মা কে.এল.এম. ১৯৮৫), পৃ. ২৪০।

[৫০] রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি* (বাঁকুড়া: গ্রন্থকার, ২০০০), পৃ. ১৪৫।

[৫১] পল্লব সেনগুপ্ত , *পূজা পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ১৪০-৪১।

[৫২] নিগূঢ়ানন্দ, পৃ. ২০৯।

[৫৩] *অমুল্যাচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৫২।

[৫৪] তদেব, পৃ. ২৫২।

বাংলার তীয়ররা দীপালীতে কালী দেবীর নিকট ছাগ বলি দেওয়ার সময় খুব তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ছাগের গলায় আঘাত করলে ছাগের মৃত্যু হয় ও বলি সম্পন্ন হয়। ছাগবলি শুধু তীয়ররা নয়, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও তা সম্প্রসারিত লক্ষ করা যায়, যা দ্রাবিড় প্রভাব বলে প্রতীয়মান।

কালী পূজায় বাংলায় যে দেওয়ালি বা দীপালি অনুষ্ঠান হয়—পথে-প্রান্তরে, গৃহকোণে, পথের তেমাথায়, পুকুর ঘাটে প্রভৃতি স্থানে—তা বাংলাদেশের সব জাতের হিন্দ মধ্যেই জনপ্রিয়। অনুরূপ দীপালি অনুষ্ঠান ওড়িশা ও দক্ষিণভারতের অনেকাঞ্চলে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।

*viii) শীতলা* : শীতলা গুটি বসন্তের দেবী। মনসা যেমন সর্পবিষহারিণী, তেমনি বসন্ত রোগহারিণী শীতলা। ওলাউঠা বা কলেরার দেবী হলেন ওলাইচণ্ডী বা ওলাদেবী বা ওলাবিবি। কলেরা ও বসন্ত নিবারণ করে শীতলতা আনয়ন করেন বলেই মনসাও শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন।[৫৫] আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, দক্ষিণভারতের বসন্ত রোগের দেবী মরীয়ম্মা, মরম্মা বা মরম্মা হেথনা, শীতলম্মা; মহীশূর জেলার গ্রাম্যদেবী সখুজম্মা, আরকট জেলার কন্নিয়ম্মা প্রভৃতির প্রভাবে বাংলাদেশে শীতলার আবির্ভাব।[৫৬]

শীতলা পূজায় ছাগ ও কবুতর বলি হয়। যশোর, বরিশাল ও নোয়াখালীতে এঁর শ্বেত মূর্তিতে পূজা হয়। ওড়িশায় যোগিনী ও বর্ধমানে দিদি ঠাকুরানী এই শ্রেণীর ঠাকুর। শীতলা পৌরাণিক দেবী। সরস্বতী, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, দুর্গা, পার্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীর মিশ্রণে পৌরাণিক যুগের শেষদিকে আর্বিভূত হয়েছেন শীতলা। বাংলাদেশে যেমন বসন্তরোগের দেবতা শীতলা, তেমনি তামিলনাড়ুতে মারি-অম্মন এবং অন্ধপ্রদেশে পোলেরম্মা বসন্ত রোগের দেবতা। তামিল ভাষায় 'মারি' শব্দের অর্থ বৃষ্টি। অর্থাৎ মারি-অম্মন বৃষ্টির দেবতাও। এই দুই দেবী গবাদিপশুর রোগ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিরও হেতুরূপে পরিচিত।[৫৭]

সমগ্র বাংলাদেশে শীতলা দেবীকে মান্য করা হলেও মেদিনীপুর, তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি ইত্যাদি অঞ্চলের মুখ্য দেবী হিসেবে শীতলা দেবী বিবেচিত। ময়মনসিংহ, সিলেট ও ত্রিপুরাঞ্চলে এই দেবী বসন্তরা বা বসন্তরায় এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও মেদিনীপুরে বসন্তরায় নামে শীতলা দেবীর পূজা হয়। এঁকে শীতলা এবং পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পুত্র বলে মনে করা হয়।[৫৮] বাংলার অন্যান্য এলাকার শীতলাকে দেবী হিসেবে মান্য করা হলেও মূর্তি গড়ে পূজার প্রচলন নেই।

*ix) পঞ্চানন্দ* : বাঙালি মহিলা কর্তৃক পূজিত ও ভয়মিশ্রিত লোকদেবতা বা অপদেবতা পঞ্চানন্দ। এঁর আরো অনেক নাম আছে, যেমন—পঞ্চানন, পাঁচু, পেঁচোঠাকুর বা বাবাঠাকুর। শিশুদের মঙ্গল কামনায়, বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান কামনায়, গৃহপালিত পশুপাখির কল্যাণ কামনায় পঞ্চানন্দপূজা বাঙালির সমাজে দেখা যায়, বিশেষ করে নদীয়া, দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় এঁর পূজা ব্যাপকাকারে লক্ষ করা যায়।[৫৯]

---

[৫৫] *Historical Studies in the Cult of Goddess Manasa* pp. 261-62. quoted from হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৪।

[৫৬] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৪।

[৫৭] T.V. Mahalingam, "The Cult of Sakti in Tamilnad" in Dinesh Chandra Sircar (ed.), *The Sakti Cult and Tara* (Calcutta : Calcutta niversity, 1967), p.3.

[৫৮] পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজা পার্বণের উৎসকথা*, পৃ. ২৭২-৭৩।

[৫৯] তারাপদ সাঁতরা (সম্পা), *কৌশিকী ১৯৭১-১৯৮৮*, খণ্ড ২, পৃ. ২৯৪।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষীরা বসবাস করে আসছে। বাংলার এই আদিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়রা তখন বেশ উন্নত ছিল। তাদের বহু দেবদেবীর ছিল। দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত তামিল, তেলুগু প্রভৃতি শাখা যারা মহীশূর বিশেষ করে তাঞ্জোর অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের সমাজের 'তীরুবয়র' ও বাংলার পঞ্চানন্দ ঠাকুরের শুধু মূর্তিই নয়, পূজাচারেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়।[৬০] অনেক গবেষক এমনকি বিশ্বকোষের সম্পাদকও পঞ্চানন্দ ও তীরুবয়র এক ও অভিন্ন দেবতা হিসেবে মনে করেন।[৬১] এসব দিক বিবেচনা করে মনে হয় বাংলার পঞ্চানন্দ ঠাকুর বাঙালির দ্রাবিড়ভাষী পূর্বপুরুষদের দ্বারা পূজিত হতো, এবং সমগ্র বাংলায় তা বর্তমানেও পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত।

*x) মাকাল : ঠাকুর* বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের উপাস্য দেবতা মাকাল ঠাকুর। অবশ্য সব এলাকার মৎস্যজীবীরা মাকালঠাকুর পূজা করে না। বাংলাদেশের জামালপুর ও দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই দেবতার পূজা বেশি দেখা যায়। চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকায় আট মাকাল পূজার প্রচলন বেশি। দু'শ' বছর আগের গ্রন্থ *তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব* গ্রন্থে মাকালের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে আছে:

'কোথায় ওলাই চণ্ডী মাকাল জলায়।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু স্থান দৃশ্যপ্রায়।'

সমসাময়িক সময়ে কবি শেখরের *কালিকামঙ্গল* কাব্যেও মাকালের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে পাওয়া যায়:

'ঘুরালো মাখাল বন্দোঁ পুরাণের ঘাটু।
তালপুরে ষষ্ঠী বন্দোঁ হাসনানের বটু॥'

মৎস্যজীবী তীয়রদের মধ্যে কারো কারো পদবি মাকাল দেখা যায়। চব্বিশ পরগনা জেলার বেশ কিছু স্থান-নাম মাকালযুক্ত, যেমন-মাকালপুর, মাকালতলা ইত্যাদি। বাংলার ও দক্ষিণভারতের দেবী-দেবীর সাদৃশ্য লক্ষ করে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন, "বাংলাদেশের ও দক্ষিণভারতের লৌকিক দেবতাদের মধ্যে এক একটির বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের 'বারা' মূর্তির সঙ্গে কুট্টন দেবরের, পঞ্চানন্দের সাথে তীরুবয়রের মিল আছে আকৃতির দিক থেকে, তেমনি মাকাল ঠাকুরের সঙ্গে মহীশূরের গ্রাম্য দেবী 'কানিয়াম্মার' শুধু মিলই নেই, কানিয়াম্মাও মৎস্যজীবীদের উপাস্য, তবে তিনি দেবী।" [৬২]

*xi) গণেশ* : গণেশ অনার্য দেবতা—একথা অনেক গবেষকই স্বীকার করেন। প্রাগ্-ইতিহাসের কোনো অজ্ঞাত পর্বে আদিবাসী জাতিমধ্যে পূজিত হস্তীদেবতা বিবর্তনের পথে মানবস্কন্দে গজমুণ্ড যুক্ত হয়ে গণেশ দেবতায় পরিণত হয়েছেন। অতীতে ও বর্তমানে লক্ষ করা যায় ধর্ম-বাণিজ্য-শিল্প সর্বত্রই গণেশের অবাধ ও শ্রদ্ধেয় অবস্থান। বাংলায় গণেশ লোকদেবতা হিসেবে অনেকাঞ্চলে গ্রাহ্য, কিন্তু ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণভারতে গণপতি হিসেবে উচ্চবর্ণের দেবতা হয়েছেন। ঋগ্বেদের 'গণ' থেকে গণপতি অর্থাৎ গণেশের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়েছে। পরবর্তীকালের *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, শিবপুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র,* মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে,* বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গলে* বা *পদ্মাপুরাণে* গণেশের উল্লেখ আছে।

---

[৬০] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা* (কলকাতা : দে'জ, ১৯৯৮), পৃ.৩৫।

[৬১] তদেব, পৃ. ৩৫।

[৬২] Rev. Whitehead, *The Village Gods of South India* উদ্বৃত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা*, পৃ. ৩।

বাংলায় যে গণেশ পূজিত হয়, টেরাকোটা শিল্পে যে গণেশ, বাণিজ্যের কল্যাণ কামনায় যে গণেশ তার সাথে দ্রাবিড় গণেশের কোনো সংস্রব আছে কিনা তা জানা দরকার। সুহৃদ কুমার ভৌমিক বলেন, "অধিকাংশ দেবদেবীর মতো গণেশের ধারণাও দক্ষিণভারতীয়।" অতুল সুর, শিল্পী সুধাংশুকুমার রায় প্রমুখ, যাঁরা সরাসরি সিন্ধু সভ্যতার লিপি ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা করেছেন, তাঁরা জানেন যে, গণেশ সিন্ধুতে বসতকারী উন্নতমানের কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাঁরা লিখন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। অনেকেই মনে করেন, গণেশের মূর্তি কল্পনায় দক্ষিণভারতীয় কোনো উপজাতিগোষ্ঠীর 'হাতি টোটেমের' ধারণা কাজ করেছে। John V. Ferriera তাঁর *Totemism in India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, এখনো দ্রাবিড়গোষ্ঠীর বিচিত্র উপজাতির মধ্যে নানা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের প্রতি টোটেমিক দুর্বলতা রয়েছে। সুহৃদকুমার ভৌমিক বলেন, "দ্রাবিড়গোষ্ঠীর কোনো একটি শাখার মধ্য দিয়ে বৃহৎ সনাতন হিন্দু সমাজে গণেশের আগমন ঘটেছে। তারপর হিন্দু রীতি অনুসারে শিব বা মহাদেবের পরিবারভুক্ত করে নেওয়া হয়।"

এখনো গণেশের অর্চনা মহারাষ্ট্রে যেমন জাঁকজমক সহকারে হয় বঙ্গদেশে ততটা নয়। তবে বাংলাদেশে যে-কোনো শুভকর্মে যেমন—জাতকর্ম, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, পুণ্যাহ, বিয়ে, হালখাতা প্রভৃতি অসংখ্য সামাজিক-মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির সূচনায় গণেশের অর্চনা হয়। ভারত ও বাংলাদেশের নানা মন্দিরে, ভাস্কর্যে, টেরাকোটা শিল্পে গণেশের যে-মূর্তি দেখা যায় তার সাথে দ্রাবিড় গণেশের সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

*xii) ধ্বজাপূজা* : প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে ধ্বজাপূজা যেমন—গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা ইত্যাদি নানা প্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব প্রচলিত ছিল। এই সব ধ্বজাপূজা এদেশীয় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর গোত্র—টোটেমের পূজা, যা পরবর্তীকালে পৌরাণিক গ্রন্থাবলিতেও দেবদেবীর বাহন হিসেবে স্থান পেয়েছে। যেমন- দুর্গাদেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, সরস্বতীর হাঁস, গণেশের ইঁদুর, লক্ষ্মীর পেঁচা, বিষ্ণুর গরুড়, গঙ্গার মকর ইত্যাদি। দেবদেবীর মূর্তিপূজার সাথে এসব ধ্বজাপূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে গুরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ, মকরকেতন প্রভৃতি পূজা-ই শুধু নয় চড়কপূজা, ধর্মপূজা, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা সর্বত্রই এখনো জনপ্রিয়। বাঙালির নিম্নবর্গের মধ্যে এখনো কোনো ধর্মকর্ম ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না। শুধু বাংলায়ই নয় সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণভারত জুড়ে ধর্মস্থান বা 'থানের' সঙ্গে ধ্বজা ও ধ্বজাপূজার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।[৬৩]

*xiii) বাস্তুপূজা:* আদিতে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় উভয় সমাজে বাস্তুনির্মাণে বাস্তুপূজার প্রচলন ছিল। বাস্তুনির্মাণ ও বাস্তুবিদ্যা আর্যরা প্রাচীনকালেই অস্ট্রিক, দ্রাবিড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। অনেকে মনে করেন, আদিতে মূর্তি কল্পনা ও তাঁর পূজা শুরু হয়েছিল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দ্বারা এবং মূর্তিকে ফুল দ্বারা সাজানোর প্রথাও তাদের থেকে গৃহীত হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে।[৬৪] অনেকের ধারণা বাস্তুপূজা-ই সর্পপূজা। গৃহনির্মাণকালে নাগের প্রসন্নতার দিকে সবিশেষ লক্ষ রেখে গৃহদ্বার নির্মিত হয়। সুকুমার সেনও বাস্তুপূজাকে নাগপূজা বলেছেন। বাংলার উত্তরবঙ্গে বাস্তুপূজার দেবতা সিজগাছও মনসা।[৬৫]

---

[৬৩] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮১-৮২।

[৬৪] তদেব, পৃ. ৪৮১-৮২।

[৬৫] সুহৃদকুমার ভৌমিক, "আদিবাসী দর্শন ও বাঙালি হিন্দুর ধর্ম চেতনা" *পূর্বাদ্রি*, ১০ম বর্ষ, লোকধর্ম সংকলন সংখ্যা, ১৯৮৯, পৃ. ২৯৭।

*xiv) গ্রামদেবতা ভূমিদেবীর পূজা:* গ্রামদেবতা ও গৃহদেবতার পূজা যে দ্রাবিড়দের নিকট থেকে বাঙালিরা গ্রহণ করেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বৃহৎ বাংলার সমতলভূমি এলাকায় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণহিন্দুর চেয়ে মিশ্রবর্ণ নিম্নবর্গের হিন্দু ও অনার্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রামদেবতা, গৃহদেবতা ও ভূমিদেবীর পূজা সমধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। বুকানন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গ্রামদেবতার পূজা সম্বন্ধে বলেন, সাধারণ মানুষ কখনোই গ্রামদেবতার পূজা ছাড়তে পারেনি। গ্রামকে তারা যে দেবতার আশ্রয়ের অধীনে বলে মনে করে, পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা সেই দেবতাকে পান, সুপারি, চাল, জল ইত্যাদি দ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করে। এই দেবতার সাধারণ কোনো নাম নেই। বিভিন্ন ভূতপ্রেত বা অন্যান্য দেবদেবী এমনকি হিন্দু দেবতাকেও তারা গ্রামদেবতা হিসেবে পূজা করে। এই পূজায় সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ বিপদ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশে মানত করে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে বলি দিয়ে বা মানতের অন্যান্য দ্রব্যাদি গ্রামদেবতাকে উৎসর্গ করে।[৬৬]

গৃহদেবতা পূজা দ্রাবিড়গণের মধ্যে গৃহস্বামীরাই করে থাকেন। এই প্রাচীন প্রথাটি এখনো সমাজে বহাল রয়েছে। গৃহদেবতার পূজা কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত করেন না। বাংলায় যে ধর্মপূজা হয় তার পুরোহিত হন গ্রামের মণ্ডল বা শিক্ষিত সাধু গোঁসাই। এটিও দ্রাবিড় প্রথা সঞ্জাত।[৬৭]

বাংলায় পৃথ্বী পূজার রীতিতে বসুন্ধরাকে দুধ কলা দেওয়া, পাথরে সিদুঁর মাখিয়ে তার পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পাথরে সিদুঁর মাখানোকে রক্তদান প্রথার নিদর্শন বলে তারা নিজেরাই স্বীকার করেন। দ্রাবিড়দের মধ্যেও রক্তদান প্রথার প্রচলন আছে। তাদের মধ্যে পৃথিবীর বিয়ে প্রথাও কোনো কোনো অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। গ্রামদেবতার সঙ্গে ধরিত্রীর বিয়ের ঘটনাও কখনো কখনো দেখা যায়।[৬৮] পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে এ ধরনের প্রথার প্রচলন এখনো লক্ষ করা যায়।

*xv) হোলি উৎস:* হোলি একটি যৌনাচার-উৎসারিত উৎসব। দাক্ষিণাত্যেও এটি যৌবনোৎসব হিসেবে পালিত হয়। সেখানে হোলি ও নববর্ষ পৃথক হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাংলায় চাঁচরের রাত্রে মেড়ার ঘর পোড়ানোর যে প্রথা আছে দাক্ষিণাত্যে ঐ রাত্রির উৎসবের নাম 'মদনদহন' (অর্থ কাম নিবৃত্তি) এবং হোলির আরেক নাম 'কামায়ন' (অর্থ কামের যাত্রারম্ভ)। এর আরেকটি নাম 'শিমাগা', কানাড়ি ভাষায় যার অর্থ 'যৌবনোৎসব'।[৬৯] বাংলাদেশের হোলি বা হোলাক উৎসব এবং বাঙালি হিন্দুর চড়ক-গাজন-ধর্মপূজার মিশ্রিত সমন্বিত রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেগুলো মূলত আর্যপূর্ব আদিম সংস্কারজাত, যা এখনো তাদের মধ্যে প্রচলিত।[৭০] সুতরাং বাংলার আদি অধিবাসী নমঃশূদ্র, বাগদি, রাজবংশী, পুণ্ড্রক্ষত্রিয়, তীয়র প্রভৃতি জাতিমধ্যে যে চড়কপূজা ও ধর্মপূজা হয় তা তাদের পূর্বপুরুষ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কোনো কোনো জাতির আদি পূর্বপুরুষের মধ্যে দ্রাবিড়ভাষীদের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হওয়াটা স্বাভাবিক।

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, বাংলার তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু বাঙালিরা যেসব লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিপূজা করেন, সেসব দেবদেবী শুধু পরিবার ও সমাজের মঙ্গল-কল্যাণ সাধন করে না, বরং কখনো কখনো তারা ভয়ঙ্কর দানবীয়রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে মানুষের পরিবার ও সমাজের ব্যাপক ক্ষতিসাধনও করে, যেমন—মনসা, শীতলা, চণ্ডী, পঞ্চানন্দ ইত্যাদি দেবদেবীর ভালোমন্দ উভয়

---

[৬৬] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, খণ্ড ৩, পৃ. ৪১৮।

[৬৭] W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, ওসমান গণি অনূদিত; *পল্লী বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৯৪।

[৬৮] *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৫২-৫৩।

[৬৯] তদেব, পৃ. ২৫৬।

[৭০] পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ. ১১৮-১৯১।

ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয় দাক্ষিণাত্যে, ওড়িশায়, বিহারে, আসামে এসব পূজা এখনো বর্তমান। দ্রাবিড়দের এসব দেবদেবীর মূর্তি ও পূজা শুধু ভারতবর্ষে নয় একসময় তা জাপান ও চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল; জাপানে প্রাপ্ত গণেশ মূর্তি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। হাজার বছর ধরে দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পাওয়া এসব মূর্তিপূজা আর্যভাষী ব্রাহ্মণ্যধর্মেও আত্তীকৃত হয়েছে। অস্ট্রিকভাষী কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কতিপয় দেবদেবীর পূজা পালিত হয়, এবং এমনকি মঙ্গোলীয় জনধারার হিন্দুধর্মাবলম্বী কোচ, রাজবংশী, টিপরাদের মধ্যেও দ্রাবিড়গণ কর্তৃক আনিত কয়েকটি মূর্তিপূজা করা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, দ্রাবিড় দেবদেবী বাঙালির ধর্মীয় চেতনায়, দর্শনে, নির্মাণে-ভাস্কর্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে।

### ৬. বাঙালির ধর্মীয় দর্শনে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ভাষী মনীষীদের প্রভাব

দ্রাবিড়দেশী কেরল-মালাবারের শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রি.) ইসলামের ঋজুবাণী ও মুসলিম মনস্বিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা না নিয়েও ইসলামি আদলে জগৎ-চেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসায় ব্রতী হন। তিনি শাস্ত্র ঘেঁটে উপনিষদ থেকে বের করে আনেন একক উপাস্য বা স্রষ্টা তত্ত্ব। এক পরম ব্রহ্মই সত্য, আর সব মায়া এবং সে-কারণে জগৎও মিথ্যা। কেবল ব্রহ্মই সত্য, একমেবাদ্বিতীয়ম-এর মানে অদ্বৈতবাদ।[৭১] নবম শতকের গোড়া থেকেই শঙ্করের এই মতবাদের প্রভাব বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ বাংলাদেশেও জনপ্রিয় এবং চৈতন্যমতবাদে তা অচিন্ত্যদ্বৈত-অদ্বৈতবাদরূপে এবং ভক্তির প্রেমে উত্তরণে পরিণতি ঘটে এই বাংলাদেশেই। এই শঙ্করভাষ্যের ভিত্তিতে ও প্রভাবে সমসাময়িককালে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, বারো শতকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বারো-তেরো শতকের নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, তেরো শতকে মাধবের দ্বৈতবাদ, ষোল শতকে বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং চৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিস্তার লাভ করে। এই শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক মাধব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ভাষী পেশাজীবী ও কেউ-কেউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।[৭২]

আবার ভক্তিবাদের প্রসার ঘটেছে নিম্নবিত্তের ও তথাকথিত অস্পৃশ্যদের মধ্যেই বেশি। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন গায়ক-বাদক ভক্তিবাদী আলোয়ার সম্প্রদায় 'কৃষ্ণনাপ্পিনাই' প্রণয়গীতিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৭৩] বিন্ধ্যপর্বত সীমারেখার দক্ষিণের লোক বলেই এরা দ্রাবিড়-ভেড্ডিড-অস্ট্রিকভাষী। এঁরাই ভাবপ্রবণ ও ভক্তিবাদী। সুতরাং বাংলায় ভাববাদের উদ্ভব ও চর্চা তাদের মাধ্যমেই এসেছে বলে মনে করা যুক্তিসঙ্গত।

অষ্টম শতাব্দীর পর দক্ষিণভারত নতুন যুগের ভারত-সংস্কৃতির পথপ্রদর্শক হয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। বিনয় ঘোষ বলেন, "অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের নতুন ধারার প্রবর্তক হল দক্ষিণভারত দাক্ষিণাত্য। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণভারতের। একেশ্বরবাদ ভক্তিবাদ বৈষ্ণবধর্ম ও শৈব ধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড়দেশে। নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণভারতের এই নতুন ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে।"[৭৪] আর

---

[৭১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃ. ৫৫।

[৭২] আহমদ শরীফ, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা* (ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৭), পৃ .৪৭।

[৭৩] তদেব, পৃ. ৫০।

[৭৪] Tarachand, *Influence of Islam on Indian culture* 1936, p.110-112; বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯০।

সেই প্রবাহ বাংলার আপামর জনসাধারণের দেহ-স্পর্শে নতুন ধর্মদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের জনজীবন নতুন ধারার ধর্ম-দর্শন ভক্তিবাদে ও একেশ্বরবাদে প্লাবিত হয়েছিল।

### ৭. বাঙালি মুসলমানের চেতনায় দ্রাবিড় প্রভাব

বাঙালি মুসলমানদের পূর্বপুরুষের রক্তে, ধর্মীয় দর্শনে, সমাজে-সংস্কৃতিতে কতটুকু দ্রাবিড় প্রভাব ছিল তা আজ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হলেও, এটুকু বলা যায় যে, তাদের মধ্যেও দ্রাবিড় রক্ত ও ধর্ম প্রভাব ছিল। এই প্রভাব যে ছিল তা আব্দুল হক চৌধুরীর *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, অতুল সুরের *বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন* , এম. এ. রহিমের *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, Beverly সম্পাদিত *Census Report of Bengal 1872*,[75] W.W. Hunter এর *Statistical Account of Bengal*[76] এবং বিনয় ঘোষের *বাংলার নবজাগৃতি*[৭৭] গ্রন্থ থেকে অনুধাবন করা যায়। এ প্রভাব মুসলমান সমাজে ছিল তা বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত তাদের সমাজে হিন্দুর আচার-সংস্কার, কৌলিক পেশা, এমনকি নামকরণে তার চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যেত। অতুল সুর লিখেছেন:

> ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তারা (মুসলমানরা) হিন্দুর অনেক সংস্কার ও লৌকিক পূজাদি অনুসরণ করত। যেমন দুর্গাপূজার সময় তারা হিন্দুদের মতো নূতন কাপড়-জামা পরে পূজা-বাড়িতে প্রতিমাদর্শন করতে যেত। ছেলে-মেয়ের বিবাহের সময়ও তারা হিন্দু জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করত। দৈনন্দিন জীবনেও তারা হিন্দুর বিধি-নিষেধ মানত ও হিন্দুর পঞ্জিকা অনুসরণ করত। মহামারীর সময় শীতলা, রক্ষাকালী প্রভৃতির পূজা করত ও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে ষষ্ঠী পূজা করত।[৭৮]

বাঙালি মুসলমানের পূর্বপুরুষগণ যে-মূর্তিপূজা অনুসরণ ও বিশ্বাস করত তা ১৯২৬ সালের *রওশন হেদায়েৎ* পত্রিকায় পাওয়া যায়:

> বহু নাদান মোছলমান কালীপূজা, দুর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, সরস্বতীপূজা, বাস্তুপূজা, চড়কপূজা, রথপূজা, পাথরপূজা, দরগাপূজা, কবরপূজা, মানিকপীরপূজা, মাদারবাঁশপূজা ইত্যাদিতে যোগদান করে ... শেরেকের মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করে, কালী, দুর্গা, কামগুরু কামাক্ষা [?] ইত্যাদি নামের দোহাই দেয়, ইত্যাদি শরিয়ত গর্হিত কার্যকরত অমূল্য ইমানকে হারাইয়া কাফেরে পরিণত হইয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিতেছে ...।[৭৯]

এ ছাড়াও রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী, রফিউদ্দিন আহমেদ, জহিরুল হাসান, ড. আহমদ শরীফ, আয়েশা খাতুন, ড. ফিরোজা বেগম প্রমুখের লেখা পড়লে এ বিষয়গুলোর সমর্থন পাওয়া যায়। ড. গোলাম মুরশিদ তাঁর *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সুতরাং বাঙালি মুসলমানের রক্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে দ্রাবিড় জাতি থেকে এসেছে সেটা

---

[৭৫] Beverly (ed.), *Census Report of Bengal 1872*, p. 132, 388.

[৭৬] W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. v, p.58.

[৭৭] বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, পৃ. ৮৪-৮৫।

[৭৮] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৪) পৃ, ১৯৪।

[৭৯] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা : অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৪৭।

আহমদ শরীফ "বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে" এবং পবিত্র সরকার প্রমুখ (সম্পা), *বঙ্গদর্পণ*, খণ্ড-১ (কলকাতা : সমাজ রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি, ২০০৫), পৃ. ২১২-২২৩।

যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত হয়। বাঙালি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে, গৃহকাজে, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির নামে, গৃহ-আসবাবপত্রে, তৈজসপত্রের নামের মধ্যে এখনো দুয়েকটি দ্রাবিড় শব্দ পাওয়া অসম্ভব নয়।

ড. আহমদ শরীফ "বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে" এক মৌখিক বক্তৃতায় বলেন:

> ভারতের অন্যত্র লিঙ্গায়েত, শাক্ত, শৈব, রাম নামী ইত্যাদির যে কোনো এক দেবতার পূজা প্রচলিত। শুধু বাঙালিই সব দেবতার পূজা করে। তাই পঞ্চোপাসক বলা হয় বাংলার হিন্দু সমাজকে। আমাদের কৃতিত্ব হল এর সবগুলোই আমাদের দেবতা, আমাদের বানানো দেবতা — আমাদের প্রয়োজনে বানিয়েছি। এই সব দেবতা বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ নামে, ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণ্য নামে, মুসলমান যুগে মুসলমান নামে চালু ছিল। কালুরায় হিন্দুর কুমির দেবতা — মুসলমানের কালুগাজী, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ-সত্যপীর প্রভৃতি সেব্য দেবতা।

সুতরাং এদেশে অস্ট্রিক দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোলীয়, মুসলমান ও অন্যান্য ভাষাভাষী জাতি-শ্রেণী-পেশাজীবী মানুষজন একত্রিত হয়ে সবার ভিন্ন ভিন্ন মত-পথ-দর্শন-ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়াবলির সমন্বয়ের ফলে নবরূপে সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি জাতি, বাঙালির দর্শন ও বাংলা ভাষা।

## ৮. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই অর্থাৎ বিন্দুসার-অশোক-মৌর্যযুগ থেকেই বাংলায় দ্রাবিড়দের পদচারণা ঘটেছে। পাল আমলে, সেন আমলে, আদিশূরের সময়ে, রাজেন্দ্র চোলদেবের সময়ে এদেশে দ্রাবিড়রা বেশি সংখ্যায় এসেছে। এদেশে তাদের দেবদবীর মূর্তি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ছাপ তারা রেখেছে। তবে তাদের কোন প্রাচীন গোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনের ছাপ আজ বাংলাদেশে কারো মধ্যে একেবারে অক্ষুণ্ন নেই। দ্রাবিড়দের রক্ত বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের রক্তে বিলীন হয়ে এখন যেমন সম্পূর্ণ বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি বাঙালির বিশেষ করে বর্ণহিন্দু ও তফসিলি হিন্দুর ধর্মীয় বিগ্রহে, দর্শনে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে দ্রাবিড় প্রভাব-ছাপচিহ্ন থাকলেও তা একান্তই পরিবর্তিত রূপে বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-৯০)

সুরাইয়া ইয়াসমীন হীরা*
অসীম কুমার সাহা**

**Abstract**: The System Theory of David Easton is one of the most empirical and effective theories in modern political science to analyze political system. This theory is used to analyze political systems in a more clear and pragmatic way. The political system has been explained through this theory when H. M. Ershad ruled Bangladesh. He had captured state power through a bloodless military coup on March 24, 1982 and in power up to December 06, 1990. The Military government of H. M. Eashad was turned into a political government in 1986 when the third *Jatiya Sangsad,* had ratified his Military rule through the 7th amendmend of Bangladesh constitution. This article is an effort to analyze the political condition of Bangladesh during 1982-1990 using the model of System Theory presented by David Easton.

## ভূমিকা

রাজনীতিবিজ্ঞান অধ্যয়নে রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়—এই উপলব্ধি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ গবেষণা শুরু করেন এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রদান করেন। এই সকল রাজনৈতিক তত্ত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাষ্ট্রের আদর্শ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে নতুন নতুন সত্যের জন্ম দেয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে তোলে। আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞানে যে সকল নতুন ও যুগান্তকারী তত্ত্ব রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলোর মধ্যে ডেভিড ইস্টন প্রদত্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাতত্ত্ব একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে সমাদৃত। আলোচ্য প্রবন্ধে ডেভিড ইস্টন প্রদত্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মডেলের আলোকে ১৯৮২-১৯৯০ সময়কালিন বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

## ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্ব

Ludwig Von Bertalanffy-এর মতে, সর্বপ্রথম ব্যবস্থা তত্ত্ব জীববিজ্ঞানে প্রদান এবং তার প্রয়োগ হয়েছে যা পরবর্তীকালে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহার করা হয়।[১] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টন ১৯৫৩ সালে তাঁর প্রকাশিত The Political System গ্রন্থে ব্যবস্থা তত্ত্বের সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন তার আলোকে রাজনীতি ব্যাখ্যা করেন এবং ১৯৬৫ সালে তাঁর

---

* প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, খুলনা ক্যাম্পাস, খুলনা।

** পিএইচ.ডি. গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১]Ludwig Von Bertalanffy, *General System Theory* (New York: Braziller, 1968), p. 86.

প্রকাশিত *A Framework for Political Analysis* এবং *A System Analysis of Political Life* গ্রন্থে এ বিষয়ে অতি স্পষ্ট করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।

ডেভিড ইস্টন-এর মতে, 'ব্যবস্থা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সহযোগী এককের এমন এক ধরনের পারস্পারিক ক্রিয়া ও ভূমিকাকে বোঝায়, যাতে ঐ এককগুলোর যে কোনো একটির পরিবর্তন অন্যগুলোর পরিবর্তন সাধন করে।'[২] সুতরাং ব্যবস্থা হচ্ছে কতিপয় উপাদানের সমষ্টি যেগুলো পারস্পারিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। কোনো ব্যবস্থার পর্যালোচনাই ব্যবস্থা তত্ত্বের মূল লক্ষ্য। ডেভিড ইস্টন সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করার জন্য বিশ্লেষণের এক হাতিয়ার রূপে এই ব্যবস্থা তত্ত্বকে দাঁড় করান।

ডেভিড ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে লক্ষ্য স্থির করে, নিজেকে রূপান্তরিত করা এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার সৃজনমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যবস্থা।'[৩] তিনি আরও বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো সামাজিক ব্যবস্থার সেই অংশ যা মর্যাদা ও মূল্যবোধের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ সাধন করে।'[৪] অর্থাৎ (ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মর্যাদা ও মূল্যবোধ বণ্টন করে, (খ) এই বণ্টন কর্তৃত্বসম্পন্ন অর্থাৎ এর পেছনে কর্তৃপক্ষীয় শক্তি বিদ্যমান এবং (গ) এই কর্তৃত্ব সম্পন্ন বণ্টন গোটা সমাজের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য।

ডেভিড ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আচরণের ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, সকল সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে মৌল বিষয়। কিন্তু মানুষের পারস্পারিক ক্রিয়ার দ্বারা ব্যবস্থা গঠিত হয়। তিনি পারস্পারিক ক্রিয়াকে ক্রিয়া ব্যবস্থার মৌলিক একক হিসেবে দেখেছেন। একটি সমাজে মানুষ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক প্রভৃতি রকমের মিথস্ক্রিয়া বা Interaction করে থাকে। এই প্রত্যেকটি ক্রিয়া এক একটি ব্যবস্থার জন্ম দেয়। ফলে মানুষের রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

সকল সামাজিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ গঠিত হয়, ফলে অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিনিময় এবং মিথস্ক্রিয়া করে থাকে। ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি মুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ডেভিড ইস্টন-এর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে স্ব-নিয়ন্ত্রিত এবং সাড়াদানকারী ব্যবস্থা। কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে চলে এবং পরিবেশের কোনো পরিবর্তন সূচিত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় রাখার প্রধান শর্ত হলো তথ্য যোগান ও ঈপ্সিত ফলাফলের মধ্যে সমতা বিধান। পরিবেশের ভিতর থেকে দাবি এবং সমর্থন উত্থাপিত হয়ে তথ্য যোগান আকারে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। এই দাবিকে সুদৃঢ় করার জন্য সমর্থন অত্যাবশ্যক। যে সব দাবি দাওয়া তথ্য যোগান আকারে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ঈপ্সিত ফলাফল আকারে বের হয়ে আসে। কিন্তু যে সব দাবি দাওয়া গৃহীত না হয়ে অপূর্ণ থেকে যায় সেগুলো তথ্য প্রেরণ ও অবগতির মাধ্যমে পুনরায় পরিবেশে ফিরে আসে এবং নতুন দাবি দাওয়ার সঙ্গে মিলে তথ্য যোগান কার্যাবলির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। আর এভাবেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যাবলি চলতে থাকে। তথ্য প্রেরণ ও অবগতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার

---

[২] David Easton, *The Analysis of Political System* in R.C. Macridis and B.E. Brown (eds.), *Introductory Essay in comparative Politics* (Illinois : The Dorsey Press, 1968), p. 91.

[৩] David Easton, *AFramework of Political Analysis* (Enylowood Cliffs : N.J.Prentice Hill,1965), p.92.

[৪] Ibid, p. 50.

তথ্য যোগান এবং ঈপ্সিত ফলাফল এর মধ্যে সমতা বজায় থাকে। উল্লেখ্য যে, তথ্য যোগান এবং ঈপ্সিত ফলাফল এর মধ্যে সমতা না থাকলে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না।

**ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-৯০)**

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ১০শে জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে একটি সংবিধান আদেশ জারি করেন। সংবিধান আদেশ ঘোষণার পর গণপরিষদ ১০শে মাসের মধ্যে সংবিধান রচনার কাজ সম্পন্ন করে। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৭ই মার্চ ১৯৭৩ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ও নতুন সংবিধানের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার। কিন্তু প্রথম জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য না থাকায় সরকার যেমন সংসদের অংশ হিসেবে বিরোধী দলকে গ্রহণ করেনি তেমনি বিরোধী দলীয় সাংসদগণ সরকারি দলের অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারকে উৎখাতের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর দেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনুকূলে না থাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে।[৫]

**ডেভিড ইস্টনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সরল মডেল**

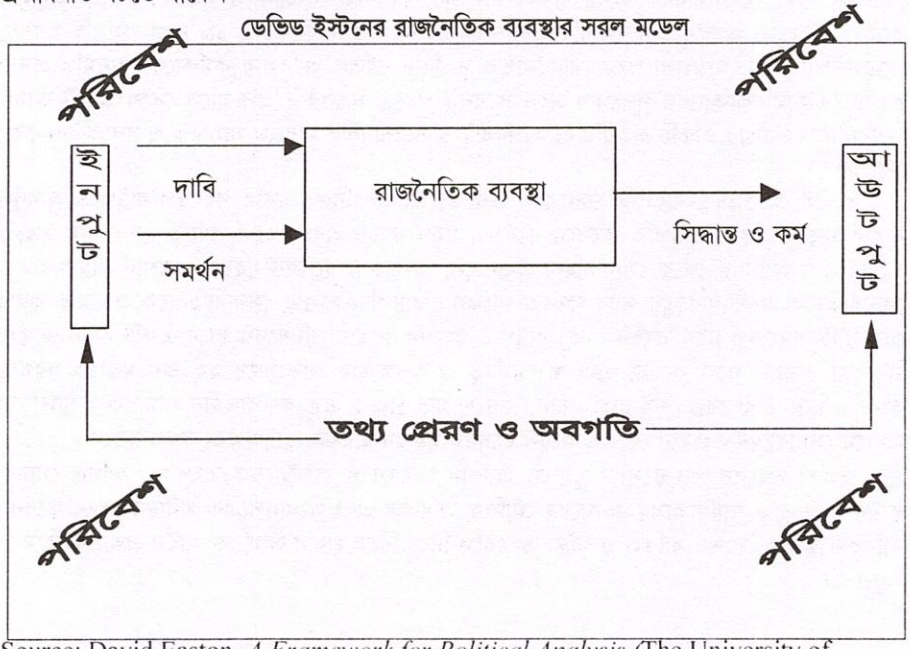


Source: David Easton, *A Framework for Political Analysis* (The University of Chicago Press, 1965), p. 112.

[৫] *জাতীয় সংসদ বিতর্ক*, খণ্ড ৩, সংখ্যা-৮, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৩০৩।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির ফলে সৃষ্ট অরাজকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে ও নিয়ন্ত্রণহীন হতে থাকলে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। অতঃপর ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫ চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা এবং বহু দলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে এক দলীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তবে আওয়ামী লীগের একটি অংশ সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানায়।[৬] একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে উপদলীয় ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রবল হয়। ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঘোষিত "দ্বিতীয় বিপ্লব"-এর উদ্দেশ্য সফল না হয়ে বরং বৈধতা, জাতীয় একাত্মতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সরকারের সমস্যাগুলো আরও জটিল রূপ ধারণ করে। এমতাবস্থায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত, খন্দকার মোস্তাক আহম্মদের নেতৃত্বাধীন মার্কিনপন্থী অংশ, আমলাদের একাংশ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী কয়েকজন অফিসারের গোপন ষড়যন্ত্র ও যোগাযোগের ভিত্তিতে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ মেজর ফারুক ও মেজর রশিদের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর একটি বিদ্রোহী গ্রুপ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে।[৭] ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের রেশ ধরে এদেশে পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ১৫ই আগস্ট এবং পরবর্তী ঘটনাবলী, বিশেষ করে পাল্টাপাল্টি সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন।

বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর ক্ষমতাকে বৈধকরণ তথা বে-সামরিকীকরণের লক্ষ্যে গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন। এছাড়াও রাজনৈতিক দলবিধি প্রণয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৯ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন, পৌরসভা নির্বাচন, মন্ত্রিসভা গঠন, রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল ও দলীয় কর্মকাণ্ডের অনুমতি প্রদান প্রভৃতি বে-সামরিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে দেশে একটি আধা-সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনকে বৈধকরণ করা হয়।

৩০শে মে ১৯৮১ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর উপ-রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার প্রথমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং পরে নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৮১ সালের মধ্য-অক্টোবর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্বের দাবি করতে থাকেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তার সেনাবাহিনীকে প্রশমিত করার জন্য দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—ক) রাষ্ট্রপতি আগের জাতীয় পরিষদের স্থানে একটি নতুন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেন, এবং খ) দুর্নীতি ও অদক্ষতার অভিযোগে ২২ জন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু তারপরেও শেষ রক্ষা হয়নি। ২৪শে মার্চ ১৯৮২ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

ক্ষমতা দখলের পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সারাদেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বাক-স্বাধীনতাসহ জনগণের মৌলিক অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। সংবিধান স্থগিত, সংসদ বাতিল ও মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হন।

---

[৬] খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ, জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, নূরে আলম সিদ্দিকী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনে দ্বিমত পোষণ করেন।

[৭] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯, ৮ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, পৃ. ৩৪।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১১ই এপ্রিল ১৯৮২ পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই দফাগুলো ছিল ৭% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন; সরকারি পর্যায়ে অপচয়মূলক ব্যয় রোধ; বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দান; অতি সত্বর খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এই পাঁচ দফা কর্মসূচিকে বিস্তৃত করে তিনি পরবর্তীতে আরও কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেগুলোর সমন্বিত রূপই তার ১৮ দফা কর্মসূচি রূপে পরিচিতি লাভ করে। এই পদক্ষেপগুলো হলো—সচিবালয় পুনর্বিন্যাস, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, মহকুমাকে জেলায় উন্নীতকরণ, বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিল্পনীতির পরিবর্তন, কৃষির অগ্রগতি, ভূমি সংস্কার, ঔষধ নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই ছাত্রসমাজ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলে তাদের উপর বিভিন্ন পর্যায়ে নির্যাতন শুরু হলে ছাত্রসমাজ আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। সরকার ছাত্রদের এই আন্দোলনকে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমনের অপচেষ্টা করে। ছাত্রদের এই আন্দোলন ছিল সামরিক শাসন ও এরশাদের অনুসৃত রাজনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যাপক বিক্ষোভের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। সামরিক সরকার এর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে আপোষ করতে বাধ্য হন। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রেপ্তারকৃত বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রদের মুক্তি ও ঘরোয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয় এবং বিতর্কিত শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা হয়।[৮]

১৯৮৩ সালে বিশাল ছাত্র আন্দোলনের পর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য দু'টি ঐক্য জোট গঠন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৫ দলীয় ঐক্যজোট। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত হয় আওয়ামী লীগ (মিজান), আওয়ামী লীগ (গাজী), জাসদ, বাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (হারুন), জাতীয় একতা পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সাম্যবাদী দল (তোয়াহ), সাম্যবাদী দল (নগেন), শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, গণ আজাদী লীগ ও মজদুর পার্টি। অপরদিকে ইউপিপি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, গণতান্ত্রিক পার্টি, ন্যাপ (নুরু), কৃষক শ্রমিক পার্টি, এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ নিয়ে বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭ দলীয় ঐক্য জোট।[৯]

উভয় জোটই সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে ৫ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। দফাগুলোর অন্যতম হচ্ছে— (ক) দ্রুত সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি প্রদান, (খ) মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, (গ) সামরিক আইনে দণ্ডিত রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দান, (ঘ) সর্বাগ্রে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং (ঙ) ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণ দান।[১০]

এই পাঁচ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে ওঠায় সরকার ১৪ নভেম্বর হতে প্রকাশ্য রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।[১১] এমতাবস্থায় জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রথমে স্থানীয় পরিষদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে

---

[৮] Md. Ataur Rahman, "Bangladesh in 1983 A Turning Point for the Military", *Asian Survey*, Vol. XXIV, No.2, February 1984, p.241.

[৯] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩।

[১০] Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics* (Dhaka : The University Press Limited, 1998), pp.107-108.

[১১] আশরাফ কায়সার, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড* (ঢাকা :মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫), পৃ. ১১৬।

নিজস্ব সমর্থনের ভিত্তি রচনা ও ক্ষমতা সুসংহতকরণ এবং ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দল গঠন করে সর্বশেষে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৭ নভেম্বর ১৯৮৩ রাষ্ট্রপতি আহ্সান উদ্দীন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে 'জনদল' নামে একটি সরকার সমর্থক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।[১২]

বিরোধী দলসমূহের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে সামরিক সরকার আরও কিছু প্রশ্নে আপোস করে। প্রশাসন থেকে জনদলের প্রতিনিধিদের অপসারণ, আঞ্চলিক ও অন্যান্য সামরিক আইন প্রশাসকের পদ বিলুপ্তকরণ, সামরিক আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বাতিল করা হয় এবং জেল থেকে প্রায় সব রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৬ই এপ্রিল ১৯৮৫ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ জনসমক্ষে প্রাক-নির্বাচনী প্রচারণাসহ নির্বাচনে স্বীয় নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করেন এবং নব নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সামরিক শাসনের অধীনে সংসদ নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দুই দফা নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করেও বিরোধী দলকে নির্বাচনে আনতে ব্যর্থ হলে ১লা মার্চ ১৯৮৫ রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সারা দেশে সামরিক আইন পুনঃপ্রবর্তন করেন।[১৩] সামরিক আইনের কড়া বিধি নিষেধের মধ্যে ২১শে মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।[১৪] 'বর্তমান সরকারের নীতি ও কর্মসূচির প্রতি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যই এই গণভোট।

ভোটারবিহীন গণভোটে ব্যাপক নিজের আনুকূল্যে নেওয়ার পর পরিবর্তিত অবস্থায় সামরিক প্রশাসন, পূর্বে বিরোধী দলগুলোর চাপের মুখে মেনে নেওয়া দাবিসমূহ অকার্যকর ঘোষণা করে। এরশাদ ১৬ ও ২০ মে ১৯৮৫ উপজেলা নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানালেও নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং কাজকর্মে সমন্বয় সাধনের অভাবে নির্বাচন প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিরোধী দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্যের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। বর্জনের আহ্বান জানালেও নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলার এবং কাজকর্মে

---

[১২] ২৭ নভেম্বর ১৯৮৩ জেনারেল এরশাদের ইঙ্গিতে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে একটি কনফারেন্সে মিলিত হন; এই কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী। রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান, জনাব এ.আর. শামসুদ্দোহাকে সেক্রেটারি, ৭ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ২ জন জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ২০৮ জন সদস্য নির্বাচিত করে গঠন করা হয় 'জনদল'। কতিপয় রাজনৈতিক কর্মী, কতিপয় অন্য রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে দলছুট নেতা-কর্মী এবং কতিপয় নেতা তাদের স্ব স্ব গোটা দল নিয়েই উক্ত সরকারি দলে যোগদান করেন। তাছাড়া বিভিন্ন মামলার আসামি ও সাজাপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তড়িঘড়ি করে সরকারি জনদলে যোগদান করেন; এম.এ.ওয়াজেদ মিয়া, *শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, মার্চ, ১৯৯৩), পৃ. ৩১৭।

[১৩] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৩ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৫ মার্চ ১৯৮৫।

[১৪] ৩০মে ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। সে গণভোটে জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির পক্ষে ৯৮.৮৮% ভোট পড়ে এবং না সূচক ভোটের সংখ্যা ছিল ১.১২%। আর ২১শে মার্চ ১৯৮৫ দ্বিতীয় গণভোটে দেশের ৪ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ৯৬৪ জন ভোটারের মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লাখ ৬৩ হাজার ৪৪২ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। যা ছিল মোট ভোটারের ৭২.১৪%। এর মধ্যে জেনারেল এরশাদের প্রতি আস্থাসূচক ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ২৫ লাখ ৩৯ হাজার ২৬৪; যা ছিল প্রদত্ত ভোটের ৯৪.১৪% এবং অনাস্থাসূচক ভোটের সংখ্যা ছিল ১৯ লাখ ১ হাজার ২১৭ টি অর্থাৎ ৫.৫০%। আর বাতিলকৃত ভোটের হার ছিল ০.৩৬% ; *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৩ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ২৯ মার্চ ১৯৮৫।

সমন্বয় সাধনের অভাবে নির্বাচন প্রতিহত হয়নি।[১৫] ১৯৮৫ সালের আগস্টে জনদলের পাশাপাশি বিএনপি (শাহ আজিজ), মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী), ইউ.পি.পি. ও গণতান্ত্রিক পার্টির নেতাদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভায় যোগদানকারী উক্ত পাঁচটি দল এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে 'জাতীয় ফ্রন্ট' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠন করে।[১৬]

জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের ফলে রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য এরশাদের পক্ষে চলে আসায় ১লা অক্টোবর ১৯৮৫ থেকে দেশে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর আরোপিত বাধা নিষেধ প্রত্যাহার করে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হয়। এসময় বিরোধী দলগুলো প্রকাশ্য রাজনীতি ও দ্রুত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি করতে থাকে। সরকার পক্ষ থেকে বিরোধী দলগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১লা জানুয়ারি ১৯৮৬ জাতীয় ফ্রন্টের শরীক দলগুলোকে একদলে পরিণত করে 'জাতীয় পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন।[১৭] একই দিনে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হয়। ২রা মার্চ ১৯৮৬ এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে এরশাদ ২৬শে এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[১৮] কিন্তু পরবর্তীতে ২৬শে এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ই মে নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়।

বিরোধী দলসমূহ সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ, সি.পি.বি., ঐক্য ন্যাপ, ন্যাপ (মোজাফফর), বাকশাল এবং জাসদের একাংশ নির্বাচনের পক্ষে নাটকীয় সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে জাসদ, বাসদ দুই গ্রুপ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল এই নির্বাচনকে আসন বণ্টন ও আঁতাতের নির্বাচন বলে ১৫ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে পাঁচ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রতিশ্রুতবদ্ধ ১৫ দলীয় জোট ৮ দলীয় জোটে রূপান্তরিত হয়।

এরশাদ বিরোধীদলের অংশগ্রহণ ছাড়াই নির্বাচন সম্পন্ন করতে চান। সুতরাং তাঁকে 'ফাঁকা মাঠে গোল দিতে দেয়া যাবে না'—এ রকম যুক্তি দেখিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট ও ৫ দলীয় ঐকজোট "এরশাদের সামরিক সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না"-এই যুক্তিতে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৯]

৭ই মে ১৯৮৬ সংসদ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোট ২৮টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে এবং ৪৫৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৫৩টিতে জয়লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসন লাভ করে সংসদে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

---

[১৫] B.M. Monoar Kabir, "Movement and Elections: Legitimization of the Military Rule in Bangladesh", *The Journal of Political Science Association*, Dhaka, 1988, p.177.

[১৬] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ২৩ আগস্ট ১৯৮৫।

[১৭] Al Masud Hasanuzzaman, p.115; Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum* (Dhaka : University Press Limited, 1993), p.23.

[১৮] Syed Sariful Islam, "Bangladesh in 1986: Entering A New Phase", *Asian Survey*, Vol. XXVI, No.2, February 1987, p.164.

[১৯] নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্নে ১৫ দলীয় ঐক্য জোটের সাথে সকল সম্পর্ক ছেদ করে ঐ জোটভুক্ত ৫টি দল ৫ দলীয় ঐক্য জোট গঠন করে। ৫ দলীয় জোটের শরীক দলগুলো হচ্ছে— জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মাহাবুব), ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল।

৫টি, ন্যাপ ৫টি, জাসদ (সিরাজ) ৩টি, বাকশাল ৩টি, ওয়ার্কাস পার্টি ৩টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ২টি, জামায়াতে ইসলামি ১০টি, মুসলিম লীগ ৪টি জাসদ (রব) ৪টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৩২টি আসন লাভ করে।[২০]

তবে এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে জনমনে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অবাধ নির্বাচন গণকমিশন নামে একটি পর্যবেক্ষক সংগঠনের আমন্ত্রণে লন্ডন থেকে অ্যানালস, মার্টিন ব্রান্ডন ব্র্যাভো এম পি ও বিবিসি'র ডেভিড জন লে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসেন। দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ করেন এবং এর জন্য প্রধানত সরকারি দলকেই দায়ী করা হয়।[২১] অধিকাংশ বিরোধী দল উক্ত নির্বাচন বাতিল করে পুননির্বাচনের দাবি জানায়।

যাহোক ১৭ই জুন ১৯৮৬ সংবিধানকে আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদের ১নং আদেশ মোতাবেক ১০ জুলাই নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন আহবান করেন। বিরোধী দলসমূহ সামরিক আইন বহাল অবস্থায় সংসদের অস্তিত্ব গণতন্ত্র বিরোধী বলে মন্তব্য করেন এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবি জানায়। কিন্তু এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার সম্পর্কে বলেন যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়।

২৬শে আগস্ট ১৯৮৬ সংসদের ৮টি আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপ-নির্বাচনে সন্ত্রাস ও কারচুপির মাত্রা ৭ই মে ১৯৮৬-এর নির্বাচনের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যায়। উক্ত উপ-নির্বাচনে প্রকাশ্যে বল প্রয়োগ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও সরকারি প্রার্থীদের পক্ষে জালভোট প্রদানের মাধ্যমে ৮টি আসনেই জাতীয় পার্টির প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে ২৫ জন স্বতন্ত্র সদস্য জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনই জাতীয় পার্টি লাভ করে। ফলে সংসদে সরকারি দলের সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ২১০।

এমতাবস্থায় ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ নির্বাচন কমিশন ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ঘোষণা করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ ১২ জন প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন যাদের মধ্যে এরশাদসহ ৪ জন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। এরশাদ ও মওলানা মোহম্মদ শাহ হাফেজ্জী হুজুর ব্যতীত সকলেই রাজনৈতিকভাবে ছিলেন অপরিচিত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্য জোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট, বামপন্থী ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করলেও ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৬ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

২৫শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১০ই নভেম্বর সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন আহবান করেন। সংসদের এই অধিবেশনে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস করা হয়। এই সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন করে ১৮ অনুচ্ছেদের পর ১৯ অনুচ্ছেদ নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়। এতে বলা হয় যে, ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখসহ ঐ দিন থেকে ১৯৮৬ সালের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত (ঐ দিনসহ) সময়কালের মধ্যে গৃহীত সকল ঘোষণা, ঘোষণা আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন বিধানাবলি, সামরিক আইন আদেশ সমূহ, সামরিক আইন নির্দেশনা সমূহ,

---

[২০] Bangladesh Election Commission, *Report on the Third Parliamentary Election 1986*, (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1986).

[২১] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৬ মে ১৯৮৬।

আদেশ সমূহ এবং অন্যান্য আইন বৈধভাবে সম্পাদিত বলে বিবেচিত হবে এবং কোনো কারণে এসবের বিরুদ্ধে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না।[২২] এছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ১ দফার 'বাষট্টি' শব্দটির স্থলে 'পঁয়ষট্টি' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়।[২৩] অর্থাৎ সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের পদের মেয়াদ বাড়িয়ে বাষট্টি বছরের স্থলে পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

১০ই নভেম্বর ১৯৮৬ জাতীয় সংসদের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন কালে ৮ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামি দলের সংসদ সদস্যরা উক্ত অধিবেশন বর্জন করলেও অন্যান্য বিরোধী দলের ১৩ জন এবং ২ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের[২৪] সমর্থনে সরকার ২২৩-০ ভোটে সংবিধানের সপ্তম সংশোধন আইন পাশ করতে সমর্থ হয়।[২৫] একই দিনে বিকাল ৪-৪০ মিনিটে বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সি.এম.এল.এ হিসেবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁর শেষ ফরমান সামরিক আইন প্রত্যাহার জারি করেন। যার মাধ্যমে অবসান হয় ৪ বছর ৭ মাস ১৬ দিন স্থায়ী সামরিক শাসন এবং পুনরুজ্জীবিত হয় বাংলাদেশের সংবিধান, যা ২৪শে মার্চ ১৯৮২ এক ঘোষণায় স্থগিত রাখা হয়।

তবে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসনের অবসান ঘটেনি। রাজনীতি ও প্রশাসনে সামরিক আমলারাই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে যান। অপরদিকে সপ্তম সংশোধনী সত্ত্বেও প্রধান বিরোধী দলসমূহ এরশাদ সরকারকে বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

জুলাই ১৯৮৭ সংসদে 'জেলা পরিষদ বিল' গৃহীত হলে বিরোধী জোট ও দলসমূহ আবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফিরে আসে। উক্ত বিলের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনে জড়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ৮ দলীয় ঐক্যজোটের সংসদ সদস্যরা উক্ত বিল পাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদ হতে বের হয়ে রাজপথে নেমে আসে এবং বিরোধী দলসমূহ উপর্যুপরি দেশব্যাপী হরতাল পালন করে। বিরোধী দলসমূহ ৭ অক্টোবর ১৯৮৭ 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি ঘোষণা করে। কিন্তু সে সময় দেশে ভয়াবহ বন্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ৭ অক্টোবরের পরিবর্তে ১০ নভেম্বর ১৯৮৭ পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সরকার ১০ নভেম্বর ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হাজার হাজার লোক রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করলে বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তুমুল

---

[২২]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, (৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত সংশোধিত), পরিশিষ্ট ১০, পৃ. ১১৫.

[২৩] তদেব, অনুচ্ছেদ ৯৬ (১), পৃ. ৩৯।

[২৪] সংবিধানের সংশোধনের জন্য জাতীয় পার্টির বাইরে যে ১৩ জন বিরোধী দলীয় ও ২ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সপ্তম সংশোধনী বিলে ভোট দিয়ে এটি পাসে সরকারকে সহায়তা করেন তারা হলেন—জাসদ (রব)-এর আ.স.ম আব্দুর রব, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হীরু, মোহাম্মদ পাঞ্জাব আলী ও মোস্তাফিজুর রহমান, মুসলিম লীগের আয়েন উদ্দীন, আ ন ম ইউসুফ, খালেকুজ্জামান খান ও আসান উল্লাহ চৌধুরী, শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন জাসদের মীর্জা সুলতান রাজা, খন্দকার খুররম, এ বি এস শাজাহান, বাকশালের সরদার আমজাদ হোসেন ও শফিকুল ইসলাম খোকা এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদক আহমেদুল কবির ও স্বতন্ত্র সদস্য বেগম লাইলা সিদ্দিকী।

[২৫]*দৈনিক আজাদ*, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

সংঘর্ষে অন্তত ১০ ব্যক্তি নিহত হন। নিহতদের মধ্যে অন্যতম ছিল নূর হোসেন নামে এক বলিষ্ঠ যুবক। নূর হোসেন তার জামাবিহীন শরীরের বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' এবং পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে একটি ছাত্র জনতার মিছিলের অগ্রভাগে ছিল। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে নূর হোসেনের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।[২৬]

ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার মুখে সরকার ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। বিরোধী দলের প্রবল আন্দোলনের মুখে ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয় এবং ৩ মার্চ ১৯৮৮ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। কিন্তু এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনরত ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল, জামায়াতে ইসলামি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় এ নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ দেখানের জন্য এরশাদ নিজেই অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর প্রভাবশালী নেতা আ. স. ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বে গঠন করান সম্মিলিত বিরোধী দল।

যাহোক প্রধান প্রধান প্রায় সকল বিরোধী দলের বয়কট ও বিরোধিতা সত্ত্বেও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন পুনর্নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় ভোট কেন্দ্রসমূহে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। এ সত্ত্বেও ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোটার উক্ত নির্বাচনে ভোট প্রদান করে বলে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে ঘোষণা করা হয়।[২৭] চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন লাভ করে। অবশিষ্ট ৪৯টি আসনের মধ্যে জাসদ (রব)-এর নেতৃত্বে গঠিত 'সম্মিলিত বিরোধী দল' ১৯টি, জাসদ (সিরাজ)- ৩টি, ফ্রিডম পার্টি ২টি, এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ২৫টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না। শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া প্রমুখ বিরোধী নেতৃবৃন্দ এই নির্বাচনকে প্রহসন ও প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যান করেন এবং অবৈধ এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবি অব্যাহত রাখেন।[২৮]

এমতাবস্থায় এরশাদ সরকার ইসলাম ধর্মকে জাতীয় ধর্মের মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী পাস করে। বিভিন্ন মহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও এরশাদ সরকার 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিল' সংসদে পাস করে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ১২ই জুন ১৯৮৮ প্রধান ৩টি বিরোধী জোটের (৮ দলীয়, ৭ দলীয় ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট) আহ্বানে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল। কিন্তু ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো এরশাদ বিরোধী কোনো আন্দোলন সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়। দেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে আদর্শগত এবং রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতিগত ব্যাপারে মতভেদ এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও এই দল দুটির নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পারিক অবিশ্বাস এবং ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, কৌশল, পথ ও পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে পার্থক্যও অনেকাংশে দায়ী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যে এরশাদ এই বিষয়গুলোর ব্যবহার করে দলদুটোর নেতৃত্বের বিরোধকে আরও প্রকট করে তুলতে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে এই দুটি দলের নেতৃত্ব এরশাদ ও তাঁর সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতার জন্য যতটা সময় ব্যয় করে তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে পারস্পরিক সমালোচনায়।

---

[২৬] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংঘাত ও পরিবর্তন* ১৯৭১-১৯৯১, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৫), পৃ. ৩৩৩-৩৩৫।

[২৭] All Masud Hasanuzzaman, p.127.

[২৮] Ibid.

১৯৮৯ সালের শুরু থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিবর্তে বরং শর্তসাপেক্ষে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য বিভিন্নমুখী তৎপরতাতেই বিরোধী দলগুলো সোচ্চার হয়। ১১ই জানুয়ারি ১৯৮৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাব-কমিটির চেয়ারম্যান স্টিফেন সোলার্জ বাংলাদেশ সফরে এলে নির্বাচন কেন্দ্রিক জল্পনা নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়। এরশাদ সরকারের বৈধতার প্রশ্ন তুলে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো একটি নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। সাহায্যদাতা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোও বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিতে থাকে। ঠিক তখনই ক্ষমতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত না থেকে এরশাদ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে জটিল করে সংবিধান সংশোধন করতে অগ্রসর হন।

৬ই জুলাই ১৯৮৯ জাতীয় সংসদে নবম সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয়, ১০শে জুলাই ১৯৮৯ সংসদে বিলটি গৃহীত হয় এবং ১১ই জুলাই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করলে তা আইনে পরিণত হয়। এই সংশোধনীতে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি উভয় পদে নির্বাচন একই সঙ্গে একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। কোনো ব্যক্তি একাধিক্রমে ৫ বছরের দু'মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না। উপ-রাষ্ট্রপতিকে কেবল জাতীয় সংসদে তিন-চতুর্থাংশ ভোটে গৃহীত অভিশংসন প্রস্তাবের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দান করবেন। এই নিয়োগ জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুমোদিত হবে এবং কেবল অনুরূপ অনুমোদন লাভের পর নবনিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ করবেন। ইতিপূর্বে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন হতো না। উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময় উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারতেন।[২৯] এছাড়া আরও বিধান করা হয় যে, যদি রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি উভয় পদই শূন্য হয় তবে জাতীয় সংসদের স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এমতাবস্থায় যদি স্পীকারের পদও শূন্য হয় তবে এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সময় যদি জাতীয় সংসদ ভঙ্গ অবস্থায় থাকে অথবা অধিবেশনে না থাকে, তবে উপযুক্ত পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার পরের দিন মধ্যাহ্নে সংসদ সত্বর অধিবেশনে মিলিত হবে এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করবে।[৩০]

এছাড়া যে কোনো সময়ে বা কারণে রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বিদায়ী রাষ্ট্রপতির মেয়াদ (৫ বছর) শেষ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে উভয় পদে একই সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে মৃত্যু, পদত্যাগ, অভিশংসন কিংবা অপসারণের কারণে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি এই উভয় পদই শূন্য হলে পদ দুটির মধ্যে যে পদটি পরে শূন্য হয় সেটি শূন্য হবার পর ১৮০ দিনের মধ্যে উভয় পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৩১]

নবম সংশোধনী পাসের পর ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদকে নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং কাজী জাফর আহমেদকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে সরকার ও জাতীয় পার্টিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ

---

[২৯]*দৈনিক সংবাদ*, ৭ জুলাই, ১৯৮৯; Bangladesh Government, *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh* (As modified up to 31st December, 1998), Dhaka, Appendix-xii, p.119-122.

[৩০]Ibid.

[৩১]Ibid.

গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও সরকারের অন্যান্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত বক্তব্য এ সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করে। সরকার একদিকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে তাদের আন্তরিকতার কথা বলতে থাকেন ও নির্বাচন প্রসঙ্গে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে, অন্যদিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে নির্বাচন হবে না একথাও বলতে থাকে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ইস্যুটি সরকার রাজনৈতিক কৌশল, রাজনৈতিক চাপ ও দরকষাকষির মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে।

নভেম্বর ১৯৮৯ সরকার ও বিরোধীদল মুখোমুখি হয়। বিরোধীদলের পক্ষ থেকে সরকারকে আলটিমেটাম দেওয়া হয়। বি.এন.পি, ৫ দল ও তার সঙ্গীরা লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৯ রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৩ই মার্চ ১৯৯০ উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পর ৮ দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনমুখী তৎপরতা চালাতে থাকে। অন্য দুটো জোট ৭ দল ও ৫ দল ১৯৮৯-এর ডিসেম্বরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯০ সালের শুরুতে বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আদায়, বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ কালাকানুন বাতিল, সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচন—এসব দাবিতে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। শেখ হাসিনা ১৯৭২-এর সংবিধানের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রসহ ৭-দফার ভিত্তিতে আন্দোলনের কথা বলেন। সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আন্দোলন আহবানের পাশাপাশি দুই প্রধান বিরোধী দল পারস্পরিক সমালোচনাও করতে থাকে যা সেপ্টেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত প্রায় একই অবস্থা চলতে থাকে।

১৪ই মে থেকে ২৫শে মে ১৯৯০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচন এবং ৬ই জুন ডাকসু নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর বিজয় আন্দোলন উদ্দীবনের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক কোন্দলে জর্জরিত বিরোধী দলগুলো এ সময় থেকে সরকারের বিরুদ্ধে শক্তি সংহতকরণে উদ্যোগী হয়। এমতাবস্থায় এরশাদ সরকার সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দশম সংশোধনী পাশ করে। এই সংশোধনীর মূল উপজীব্য হচ্ছে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ নবায়ন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি ভাষ্যের অসঙ্গতি দূর করে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবার পর পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ সংশোধন করা।

এ সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে আন্দোলন তৎপরতা জোরদার হয়। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বি.এন.পি'র অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন ডাকসু কনভেনশনের মাধ্যমে আন্দোলন কর্মসূচি অর্থবহ করার উদ্যোগ নেয়। একই সঙ্গে গণতন্ত্রমনা সকল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার বিরোধী মনোভাব সম্প্রসারিত হয়। এ পরিস্থিতিতে বি.এন.পি'র অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের অন্যতম নেতা ও তৎকালীন ডাকসুর সহ-সভাপতি আমান উল্লাহ আমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগসহ অন্যান্য সকল গণতন্ত্রমনা ও স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' গঠিত হয়। ১০ই অক্টোবর ১৯৯০ ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটগুলো আহুত বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি। সে ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতা ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের সহিংস সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে উল্লাপাড়া কলেজের ছাত্র জেহাদসহ ৫ জন নিহত এবং ৪০ জন পুলিশসহ তিন শতকেরও বেশি ছাত্র-জনতা আহত হয়। ঐ দিনই গণতন্ত্রমনা ও স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র সংগঠন সমূহের কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতারা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের ব্যানারে সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ঘোষণা দেন।

১০ই অক্টোবরের পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট এর আহবানে ১১ই অক্টোবর ১৯৯০ হরতাল পালিত হয়। এ দিন সকাল ১১ টার দিকে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিলসহ শাহবাগ চৌরাস্তার মোড়ে পৌছলে পুলিশ তাদের ওপর বেপরোয়াভাবে লাঠি চার্জ করে।

পুলিশের এহেন নির্যাতনমূলক আচরণের প্রতিবাদে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৩ই অক্টোবর ১৯৯০ ধর্মঘট পালনের আহবান করা হয়। ১৩ই অক্টোবর ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মনিরুজ্জামান মনিরসহ দুজন ছাত্র নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে এরশাদ সরকার এক অধ্যাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ১৪ই অক্টোবর ১৯৯০ দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘটিত সংঘর্ষে ৫৫ জন ছাত্র জনতা আহত হয়। ঐ দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাকে তার স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। একই দিনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা এবং উক্ত সভায় ছাত্ররা ১৫ দিনব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। অপরদিকে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোটগুলো স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন আন্দোলনের ঐক্যের প্রশ্নে অভিন্ন মত ব্যক্ত করে পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করে। অতঃপর ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ আন্দোলনের লক্ষ্য ও ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা সম্পর্কে ৩ জোট যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণায় বলা হয়:

১. অবিলম্বে এরশাদ ও তাঁর সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে, সংবিধানের সংশিষ্ট বিধান অনুযায়ী ৫১ ধারার (ক) ৩ উপধারা ৫৫ ধারার ক (১) উপধারা এবং ৫১ ধারার ৩ নং উপধারা অনুসরণ করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জোট ও দলসমূহের এবং দেশপ্রেমিক সকল শক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

২. এই নতুন রাষ্ট্রপতির নের্তৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বর্তমান জাতীয় সংসদ বিলোপ করে ৩ মাসের মধ্যে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের পর নির্ধারিত জাতীয় সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৩. এই অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ; সকলের নিকট আস্থাভাজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন; নির্বাচন কাজ পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব সর্বত্র নিশ্চিত; নির্বাচনকে যে কোনো প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা; গণপ্রচারমাধ্যমের নিরপেক্ষ ব্যবহার; ভোট কারচুপি প্রতিরোধে কার্যকর নিবৃত্তিমূলক কঠোর ব্যবস্থা ও নির্বাচনের নিরপেক্ষতা; পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষকদের সুযোগ দান করতে হবে।

৪. দেশে স্থায়ীভাবে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সাংবিধানিক ধারা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় অন্তরে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার ধারা সুপ্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অব্যাহত অগ্রগতি নিশ্চিতকল্পে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোনো পন্থায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। নিবর্তনমূলক কালাকানুন বাতিল করতে হবে এবং এরূপ কোনো আইন

কখনও প্রণয়ন করা যাবে না। গণপ্রচার মাধ্যমকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করা হবে।[৩২]

তিন জোটের এই দাবিগুলো তথ্য যোগান-এর মাধ্যমে যখন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (Political System) আসে তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দাবিগুলো না মানার সিদ্ধান্ত হয়। এই Decission এবং Action যখন ঈপ্সিত ফলাফল আকারে Feedback-এর মাধ্যমে এলো তখন দেশের জনগণ এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি। ফলে আন্দোলনের প্রচণ্ডতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ২৭ নভেম্বর ডা. মিলনের মৃত্যুর পর সারাদেশে ছাত্র জনতার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চরম জঙ্গি আকার পরিগ্রহ করে। ঐদিনই এরশাদ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে কার্ফু জারি করা হয়। কিন্তু জরুরি আইন ও কার্ফু ভঙ্গ করে ছাত্র-ছাত্রী শ্রমিক-জনতা, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা নেমে আসেন বিক্ষোভ মিছিলে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ-জনতার সংঘর্ষে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। সাংবাদিকদের ধর্মঘটের ফলে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারগণ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীগণ বর্জন করেন রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠান এবং আইনজীবীরা বর্জন করেন আদালত। এমন কি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ সরকারবিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৩৩]

এমতাবস্থায় এরশাদ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯০ ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের ১৫ দিন পূর্বে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাবিত নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ ঘোষণা করেননি। বিরোধী জোট ও সংগঠন সমূহের কাছে এরশাদের এই ঘোষণা তার শাসনকে দীর্ঘায়িত করার একটি অপকৌশল হিসেবে মনে হওয়ায় তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯০ অবিলম্বে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক নেতা কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা কর্মী এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ এতই ব্যাপক ছিল যে, পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর সদস্যরা পিছু হটতে শুরু করে। সেনাবাহিনীও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ফলে গণঅভ্যুত্থানের রায়ের নিকট নতি স্বীকার করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ৪ ডিসেম্বর রাতেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন যা এই দিন রাত ১০ টার পর রেডিও টিভিতে সম্প্রচার করা হয়। বিরোধী দলগুলোর নিকট নিরপেক্ষ উপ-রাষ্ট্রপতির নাম আহ্বান করা হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের ঢল নিমিষেই রূপান্তরিত হয় আনন্দ উচ্ছ্বাসমুখর বিজয় মিছিলে।[৩৪]

৫ই ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট সর্বসম্মতভাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করে। ঐ দিনই এরশাদ চতুর্থ জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে নিজে পদত্যাগ করেন। এভাবে এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।[৩৫]

---

[৩২] Q. A. Tahamina, Philip Gain and Shishir Moral (ed.), *Hand Book on Election Reporting* (Dhaka : SEHD, 1995), p. 121.

[৩৩] Ibid, p. 124.

[৩৪] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৯ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি ১৯৯১।

[৩৫] Al Masud Hassanuzzaman, p.135.

ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্বে আমরা দেখেছি তথ্য যোগান এবং ঈপ্সিত ফলাফল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এ দুই বিষয়ের সমতা নাকি ভারসাম্যতার মধ্যে সমতা না থাকে তবে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে একথা বিশেষভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ডেভিড ইস্টনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তত্ত্বের আলোকে ১৯৮২-১৯৯০ সময়কালীন বাংলাদেশের রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ লক্ষ করা যায়:

২৪শে মার্চ ১৯৮২ জেনারেল এরশাদ বিনা প্রতিরোধে ক্ষমতা দখল করলেও কোনো রাজনৈতিক দল তার সরকারের বৈধতা স্বীকার করেনি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ১৫ দলীয় এবং ৭ দলীয় জোট অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও একটি নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৫ দফা দাবি উত্থাপন করে। বিক্ষোভ, মিছিল, হরতাল ঘেরাও ইত্যাদি জোটদলসমূহের আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল। তাদের ৫ দফা দাবি তথ্য যোগান আকারে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্থাপিত হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকাশ্য রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়, কিছু রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু ৫ দফার মূল দাবি 'সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর' না মানায় তা Feed back-এর মাধ্যমে তা আবার রাজনৈতিক পরিবেশে ফিরে আসে এবং জোটসমূহ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তাদের চাপের মুখে এরশাদ সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দিতে রাজি হন। কিন্তু সামরিক শাসনের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোটসমূহের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের একাংশ (৮ দল) ও জামায়াত ইসলামিসহ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও বি.এন.পি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং ১৫ দলীয় জোটের একাংশ (৫ দল) ঐ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করলেও ৮ দল ও জামায়াতে ইসলামি সংসদে যোগদান করে এবং সংসদের ভিতরে ও বাহিরে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। অপরদিকে ৭ দল ও ৫ দল জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুনভাবে সংসদ নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করে। এরশাদ নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে তার সামরিক কর্মকাণ্ডকে বৈধ করিয়ে নিলেও দেশের রাজনৈতিক জোটসমূহ তাকে বৈধ সরকার হিসেবে গ্রহণ করেনি। ফলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এসময় এরশাদ আন্দোলন দমনের জন্য জেল, হত্যাসহ সকল প্রকার নিপীড়ন এবং বিভাজন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার মুখে সরকার ২৭শে নভেম্বর ১৯৮৭ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ৬ই ডিসেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং ৩রা মার্চ ১৯৮৮ জাতীয় সংসদের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দল এই নির্বাচন বর্জন করে। ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনের পর হতে বিরোধী দলসমূহ নিজেদের মধ্যে কোন্দলে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি এরশাদ ঘোষণা করেন যে, আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তিনি প্রার্থী হবেন। এই অবস্থায় বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে আন্দোলনে নামে। ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ সরকার বিরোধীদের স্বাক্ষরিত দাবি তথ্য যোগান হিসেবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিকট উত্থাপিত হয়। দাবি ঈপ্সিত ফলাফল-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হিসেবে বের হয়ে আসে এবং সিদ্ধান্ত হয় যে দাবিগুলো মেনে নেওয়া হবে না। ফলে আন্দোলনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়। আর এই প্রচণ্ড গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে অবিলম্বে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। সুতরাং বলা যায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার তথ্য যোগান এবং ঈপ্সিত ফলাফলের মধ্যে সমতা বিধান করা সম্ভব হয়নি বলেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

ডেভিড ইস্টন প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বিজ্ঞানের কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তথাপি কিছু দুর্বল দিক থাকার

কারণে এই তত্ত্ব বিভিন্নভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। Herbert Spiro-এর মতে এই তত্ত্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি ব্যবস্থা এর পরিবেশের পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেও নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে পারে তাই এই তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য নয়। এই তত্ত্বে পরিবর্তনের কথা বলা হলেও পরিবর্তনের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্থিতিশীলতার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় ব্যবস্থা তত্ত্ব রক্ষণশীলতাকে একটি আদর্শ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ব্যবস্থা তত্ত্বে স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে সংঘাত ও ভিন্ন মতকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর মনে করা হয় এবং ঐক্যমত্যকে ব্যবস্থার ভিত্তিমূল গণ্য করা হয়। কিন্তু একটি সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী শ্রেণী ও স্বার্থ বিদ্যমান অথচ সংঘাত ও ভিন্ন মত থাকবে না এমনটি আশা করা যায় না।[৩৬] Lewis Coser-এর মতে, ভিন্নমত আর সংঘাত অনেক সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিক সুদৃঢ় করে। বিভিন্ন গোষ্ঠী দল ও শ্রেণীর মধ্যে মতানৈক্য ও সংঘাত তাদের মধ্যে নতুন এক স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং কালক্রমে একাত্মতার সংকট নিরসন হয়।[৩৭]

Darid Easton রাজনীতির ব্যাখ্যা দিলেও তা অস্পষ্ট। যদি ও তিনি রাজনৈতিক উপাদানকে সমাজে জীবন উপকরণসমূহের কর্তৃত্বপূর্ণ বরাদ্দ বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু সমাজের সকল ক্ষেত্রে এরূপ কর্তৃত্ব কাজটি সংঘটিত হলে কোনোটি রাজনৈতিক তা নির্ধারণ করা অসম্ভব।

ব্যবস্থাত্ত্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত দিক অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতির সরকার সম্পর্কে কোনো বিশ্লষণের অবকাশ নেই। কর্তৃত্ব, আনুগত্য সম্পর্কিত মৌল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট নয়।

Paul Kress-এর মতে এই তত্ত্ব তথ্যের উপর অধিক গুরুত্ব দিলেও তথ্যের অর্থ ও তাৎপর্যের জন্য আরও কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল যা করা হয়নি। তিনি বলেন, একটা তত্ত্ব তথ্যের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল অথচ বিষয়বস্তুর আকার এটা একটি অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি এ তত্ত্বকে রাজনীতির শূন্য দর্শন বলে মনে করেন। এই তত্ত্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কেবল তথ্যযোগান ও ঈপ্সিত ফলাফলের প্রবাহ বলে মনে করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক জীবনকে তথ্যযোগান ও ঈপ্সিত ফলাফল প্রবাহের মতো প্রক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।[৩৮]

## উপসংহার

সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই তত্ত্ব যথার্থ বাস্তবানুগ ও কার্যকর তত্ত্ব। তিনি সে সুসংহত তাত্ত্বিক ব্যবস্থা গঠন করেছেন তার সাহায্যে যে কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থা অধ্যয়নে ব্যবস্থা তত্ত্বের আদিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এর আবেদন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর ব্যাপক সংখ্যক রাজনীতি গবেষক ব্যবস্থা তত্ত্বকে অনুসরণ করে তাদের অধ্যয়ন কার্য পরিচালনা করেছেন। কাজেই সামান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ব্যবস্থা তত্ত্ব রাজনীতি অধ্যয়নে এক অনন্য তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত। একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, ডেভিড ইস্টন তাঁর ব্যবস্থা তত্ত্বের মাধ্যমে যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন, তা আজও রাজনীতি অধ্যয়নে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালীর সাথে পরিচিত হতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

---

[৩৬]Herbert Spiro, "An Evaluation of System Theory", in Charlesworth, ed., *Contemporary Political Analysis*, pp. 73-74.

[৩৭]Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict* (Newyork: Free Press, 1956), pp. 34-35.

[৩৮]Quoted in S.P. Varma, *Modern Political Theory,* Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1975, p. 182.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# বাংলাদেশের আদিবাসী-উপজাতি বিতর্ক

মোঃ আজিজুল হক*

**Abstract:** The terms *upajati* and *adibasi* create controversy on identity of the ethnic minority in Bangladesh. The Foreign Ministrty of Bangladesh requested the Ministry of Chittagong Hill Trackts' to use *upajati* instead of indiginous. Ministry of Law and Home Affairs also advised to use this terms. About two thousand years ago, all kinds of tribes like *chakma* and *santal* came to this country from several parts of India. They do not follow primitive religion and culture. In this context, they could not claind themselves as indiginous. On the contrary, the Bengali people (both Hindu and Muslim) are the root inhabitants. In this article the author tried to explain the controversial arguments on *upajati* and *adibasi*.

## ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশে 'উপজাতি' এবং 'আদিবাসী' শব্দ দুটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো 'উপজাতি' হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও সাম্প্রতিককালে এ নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তারা এক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। কিন্তু তারা নিজেদের 'জাতি' হিসেবে দাবি না করে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি চাচ্ছে। এ দাবিতে তারা মিছিল-মিটিং ও আন্দোলন করছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এসব মানুষেরা নিজেদের আদিবাসী বলে পরিচিত করাতে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং বাঙালিদের মধ্যেও কেউ কেউ তাদের আদিবাসী বলে অভিহিত করছে। উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ উপজাতি নিজেদের 'আদিবাসী' বলতে পছন্দ করে । ১৯৯৩ সালকে 'আদিবাসী বর্ষ' ঘোষণা এবং আদিবাসীদের উন্নয়নে জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিটির আওতায় কোটি কোটি ডলার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিষয়টি বেশ জোরালো হয়েছে। এরপর এই বিতর্ক রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়ে নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে খ্রিস্টান মিশন, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন (এনজিও), বাম চিন্তাধারার বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। উপজাতি জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত মানুষ এবং সংগঠনগুলো আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনে নেমেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আদিবাসী শব্দ ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী এবং তাদের মতে উপজাতিরা নয় বরং বাঙালিরাই এদেশের মূল

* ড. মোঃ আজিজুল হক, আঞ্চলিক পরিচালক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

বাসিন্দা বা আদিবাসী। এ কারণে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৯৯৩ সালে বা পরবর্তী পর্যায়ে আদিবাসী বর্ষ পালিত হয়নি।

**আদিবাসী / উপজাতি প্রত্যয়ের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা**

বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের উপজাতি বলে সম্বোধন করা হয়, তাদেরকে ১৯৩১ সালের পূর্ব পর্যন্ত এনিমিস্ট (Animist) বা প্রকৃতিপূজারী বা প্রকৃতি-উপাসক বলা হতো। ১৯৩১ সালের আদম শুমারিতে প্রথমবারের মতো এদেরকে 'আদিম উপজাতি' বলে চিহ্নিত করা হয়। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ভারত উপমহাদেশকে একটি বিরাট জালের সাথে তুলনা করেছেন এবং এতে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি এবং জনগণ ভেসে এসে ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষে বহুজাতি, বহুধর্ম ও বিচিত্র ভাষাভাষী মানুষের মহামিলন হয়েছে। আদিবাসী বা উপজাতি বা নিম্নজাতি বলে চিহ্নিত এ মানুষগুলোকে ভারতে 'তফসিলি উপজাতি' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা আট ভাগ উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও বাংলাদেশে এদের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগেরও কম (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯১:১১)। ভারতে প্রাচীনকাল হতে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা উপজাতির সকল গ্রুপ বা সব উপজাতি বাংলাদেশে নেই। এদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী কমবেশি প্রায় দুই শতাব্দীকাল পূর্বে বৃহৎ ভারতভূমি হতে এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছে।

ভারতবর্ষে বসবাসরত উপজাতিদের মধ্যে কোল, ভীল, শবর, গন্দ, টোডা, মেচ, কাদার, ইরুলা, চেনচু, কুরুম্বা, বাদাগা, সেমানাগা, লিম্বুরা, লেপচা, লোধা, হারো, রাবহা, গোরিয়াত, কারমালি, সুরিয়া, বেনিয়া, ছেত্রী, কাথী, লালকাফ্রি, পাঠান, খোরা, মিচি, বোদো, ওনা, ভেদ্দা, খাড়িয়া, বীরহোড়, কোড়া, হোপী, চিরু, খণ্ড, মারিয়া, বাইগা, কাছাড়, খাসি, পরধান, পরাজ, হাগাড়িয়া, খাটাশ, ধোড়িয়া, নাইকড়া, বর্লি, দামাই, গুরুই, নেওয়ার, সুনুওয়ার, নায়ার, বাহেলিয়া, ঝিমিয়া, পান, পার্শি, দোসাদ, রাঙ্গা, নাগেসিয়া, ভোটিয়া, (Troisi, 1979, Vol-X:32) ইত্যাদি উপজাতির অস্তিত্ব বর্তমানে বাংলাদেশে নেই অর্থাৎ এ জনগোষ্ঠীর মানুষ শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছে। পক্ষান্তরে, সাঁওতাল, উঁরাও, মুণ্ডা, মাহালী, মাহাতো, পাহান, পাহাড়ী, কোঁচ, কৈবর্ত, মালো, রাজবংশী, চাকমা, মারমা, খাসিয়া, মনিপুরী, গারো, টিপরা, ম্রো, লুসাই, কুকী ইত্যাদি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারত-বাংলাদেশ উভয় অংশে বংশ পরম্পরায় বসবাস করছে। বাংলাদেশে বসবাসরত অধিকাংশ উপজাতির উৎসভূমি ভারত এবং এদের মূল জনপ্রবাহ ভারতেই অবস্থান করছে বলে সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশে বসবাসরত সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রবীণ মানুষেরা তাদের পূর্বপুরুষদের ভারত হতে বাংলাদেশে আগমনকে অকপটে স্বীকার করেন। এছাড়া চাকমা, মারমা, গারো, টিপরা, সাঁওতাল, উঁরাও, মুণ্ডা, পাহাড়ী, মাহালীসহ সকল উপজাতির উৎপত্তি ও আদি উৎসভূমি ছিল ভারত, এ কথা উপজাতি বিষয়ক সকল গ্রন্থসূত্রে প্রমাণিত হয়। যাযাবর বৈশিষ্ট্যের এসব উপজাতি বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে এবং বর্তমান প্রজন্ম সকলেই জন্মসূত্রে বাংলাদেশী। বিষয়টিকে সহজভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য মণিপুরী নৃগোষ্ঠীর লেখক ও গবেষক, মৌলভীবাজার মণিপুরী ললিতকলা একাডেমীর পরিচালক রামকান্ত সিংহ একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, অভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপজাতি শব্দটি কোনোক্রমেই অবমাননাকর বা ব্যাঙ্গাত্মক সূচক নয়। বরং এটি বৃহৎ জাতির পাশে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র জাতির অবস্থানকে নির্দেশ করে। যেমন একটি সাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম সাগরকে বলা হয় 'উপসাগর', একটি দ্বীপ অপেক্ষা ছোট দ্বীপকে বলা হয় 'উপ-দ্বীপ', একটি বড় নদীর তুলনায় ছোট নদীকে 'উপ-নদী', একটি মূল আইন অপেক্ষা সহায়ক ছোট আইনকে 'উপ-আইন', একটি ধারার সমর্থনযোগ্য ধারাকে 'উপ-ধারা', একটি বিধির সমর্থনযোগ্য বিধিকে বলা হয় 'উপ-বিধি'(সিংহ, ২০০৩:৩৩)।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'আদিবাসী' সংজ্ঞার আওতায় পড়ে কিনা। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার বলেন, আদিবাসী শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করলে যে বস্তুনিষ্ঠ উপাত্ত পাওয়া যায় তার আওতায় এরা কেউ পড়ে না। মূলত আদিবাসী জনগোষ্ঠী বলতে তাদেরকেই বোঝায় যারা প্রাচীনকাল থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে এবং যারা নিজেদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় রক্ষণশীল, যাদের নিজস্ব ভাষা, আলাদা দৈহিক গঠনসহ অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও সত্তা রয়েছে, যা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে থাকে (সরকার, ১৯৯৮:১৪৫)। আদিবাসী শব্দের সহজ অর্থ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, (ক). যারা আদিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, (আদিম সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, শিকার ও সংগ্রহ অর্থনীতি, প্রাকৃতিক শ্রমবিভাগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি ও আদিম সাম্যবাদ, ভাষার কোনো বর্ণ না থাকা এবং ইঙ্গিতে কথা বলা, যাযাবর ও গোত্রভিত্তিক জীবন, অবাধ যৌনাচার ও গোষ্ঠী বিবাহ, লজ্জার চেতনা না থাকা (পোশাক না পরা), কাঠামোবদ্ধ পরিবার না থাকা, নিজস্ব সরকার ও বিচার ব্যবস্থা, প্রকৃতিপূজা ইত্যাদি); অথবা (খ). যারা প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে এ অঞ্চলের বাসিন্দা। সুতরাং ওপরের বৈশিষ্ট্যকে যদি সমাজতাত্ত্বিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় তবে দেখা যায়, বাংলাদেশের কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীই এসব বৈশিষ্ট্য বহন করে না। বরং কোনো কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সর্বাংশে তাদের উপজাতীয় বা আদিম চরিত্র ত্যাগ করেছে। এদের অধিকাংশই নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছে, আলাদা মূল্যবোধ ও জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাস ও আদিবাসী প্রকৃতিপূজারী মানুষের ধর্মবিশ্বাস এক নয়। ধর্ম যেহেতু মানুষের জীবনদর্শন, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি নির্ধারণ করে, সেক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত উপজাতিরা চিরায়ত প্রথা-প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে সর্বক্ষেত্রে নতুন ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে সবকিছু ব্যাখ্যা করছে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধর্মান্তরিত এসব মানুষ চিরায়ত পল্লির সমাজ-সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ তারা প্রকৃতিপূজারী নয়। এ কারণে তারা পূজা-পর্ব ত্যাগ করার পাশাপাশি অন্যকে তা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করছে, বিভিন্ন বিষয়ে নবতর ব্যাখ্যা সংযোজন করছে। এ কারণে চিরায়ত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মতে, ধর্মান্তরিতরা আদিবাসী বা উপজাতি কোনো সংজ্ঞার আয়তায় পড়ে না। তাদের যুক্তি "যদি কোনো সাঁওতাল বা চাকমা মুসলিম হয় তবে কি আমরা তাকে মুসলিম সাঁওতাল বা মুসলিম চাকমা বলবো" ? যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয় তবে ধর্মান্ত রিতরা কেন ' খ্রিস্টান সাঁওতাল' বলে পরিচিতি পাবে ? প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধর্মান্তরিতরাই সরকার প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে এবং তা আদিবাসীদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। এরাই আদিবাসী বলে নিজেদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি করছে। কারণ ক্ষমতার স্বাদ তারা পুরোমাত্রায় উপভোগ করছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে 'আদিবাসী' বলে অভিহিত করলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায়, এদেশের মূল জনগোষ্ঠী বাঙালি সম্প্রদায় কি বহিরাগত? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাঙালিদের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের এবং তাদের উৎপত্তি ও বিকাশ এদেশের মাটিকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং বাঙালিদের আদিবাসী না বলে বহিরাগত অভিবাসীদের আদিবাসী দাবির রহস্য উদ্ঘাটন হওয়া জরুরি। বাস্তুত্যাগী বাঙালিরা বিদেশে চাকুরি করতে গিয়ে অনেকেই বিদেশে নাগরিকত্ব পেয়েছে, তারা যদি এখন সেসব দেশে নিজেদের 'আদিবাসী' দাবি করে, তা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি বিদেশিরা যদি সংখ্যানুপাতিক কারণে বাঙালিদের উপজাতি বলে তাও সঠিক নয়। বাংলাদেশের উপজাতির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তারা উপজাতি না হলে আদিবাসীও নয় বরং তারা বাংলাদেশি এবং এক একটি ক্ষুদ্র জাতি।

ব্রিটিশ শাসনামলে উপনিবেশিক অফিসারগণ প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে Hill Tribe কথাটি চালু করে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তদানীন্তন উপনিবেশিক অফিসার কর্তৃক কখনো Tribal বা Aboriginal নামে অভিহিত হয়েছে। বর্তমানে সভ্য সমাজের চিন্তা-চেতনায় Linguistical Minor কিংবা Ethnic Community People, Primitive Man ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে সমাজবিজ্ঞানী Bessaignet সাহেব ১৯৫৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে বলেন যে, আজ আর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের আদিম (Primitive) বলা যায় না। কারণ তারা আদিম বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে।

নৃতত্ত্বের সংজ্ঞায় আদিবাসী বা উপজাতি বলে কোনো স্বতন্ত্র নরগোষ্ঠী বা মানব গোত্র নেই। ভারতের প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ সুবোধ ঘোষ বলেন, ভারতের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাযাবর সমাজ আছে, যাদের মধ্যে বর্তমান উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আছে। এদের উপজাতীয় না বলে উপসমাজ বলা ভালো। এদের সম্পর্কে গোষ্ঠী বা 'Tribe' কথাটি ব্যবহৃত হলেও এদের উপজাতি না বলে উপসমাজ বলা উচিত (ঘোষ, ১৯৯৪:২৩০)। তাঁর মতে, এরা আদিবাসীও নয়, উপজাতিও নয়। ভারতে কোনো কোনো সরকারি সেন্সাস বিবরণীতে এবং নৃতাত্ত্বিকের বর্ণনায় এ সব সমাজকে 'উপ-জাত (Sub-Caste)'বলা হয়েছে। উল্লিখিত প্রত্যেকটি উপসমাজ বাংলায় বাহির হতে আগত এবং সরকারী খাতায় অনেকে অপরাধপ্রবণ জাতি রূপে চিহ্নিত (তদেব:২৩৮)। জাতিসংঘের প্রস্তাবনায় আদিবাসী সম্পর্কে গবেষণারত একটি বিশেষজ্ঞ টিমের মতে:

> Indigenous communities, peoples and nations are those which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from the other sections of the societies now prevailing in those territories or parts of them. They from at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral terrotories and their ethnic identity as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems. In short, Indigenous peoples are the descendants of the original inhabitants of a territory overcome by conquest or settlement by aliens (Special Report of Mr. Martinez Cobo, UNO,1984).

পক্ষান্তরে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসী বর্ষ ঘোষণার প্রেক্ষিতে আদিবাসীর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে:

> Indigenous people are such population groups as we are, who from old age times have inhabited the lands when we live, who are awere of having a characters of our own, with social tradition and means of expression that are linked to the country inhabited from our ancesters,with a language or our own and having certain essential and unique characteristics which confer upon us the strong conviction of belonging to a people, who have an identity in ourselves and should be thus regarded by others (UNO,1993).

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)এর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলনে আদিবাসী চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে:

> Peoples in indipendent countries who are regarded as indigenous

> on account of their descent from the populations which inhabitated the country or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state bounderies and who irrespective of their legal status, retain some or all of their social, cultural and political institutions (ILO,1989).

জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক ঘোষিত আদিবাসী সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, উপজাতীয়রা আদিবাসীর আওতায় পড়ে না। কারণ উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আদিবাসী মানব সমাজ, জনগোষ্ঠী অথবা জাতিসত্তার পরিচিতি পাবার অধিকারী হবেন তারাই, যাদের প্রাক-আগ্রাসন ও প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের আগে থেকেই একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, যা তারা নিজ বাসভূমিতে তৈরি করেছিল। যারা আদিম সংস্কৃতির ধারক এবং যারা নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে মেনে চলে, অন্যান্য মানবকুল থেকে নিজের একটি বিশেষত্বময় পৃথক সত্তার অধিকারী মনে করেন। এ সংজ্ঞার শর্তই হলো, যাদের প্রাক আগ্রাসন ও প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের আগে থেকেই একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে। স্যার রিজলে, হান্টার, ও'ম্যালে, স্ক্রেফসরুড প্রমুখ ব্রিটিশ প্রশাসক লিখিত বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল গ্রন্থ সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, এ দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের আগমন খুব বেশি হলে এক বা দুই শতাব্দীকাল আগে। এদেশে উপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসক ও জমিদারগণ বন-জঙ্গল পরিষ্কার, আবাদযোগ্য জমি তৈরি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কয়লাখনি শ্রমিক, রেলওয়ে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডাদের তৎকালীন বাংলায় নিয়ে এসে নিয়োগ করেছিল। এদেশে আগন্তুক উপজাতিরা তৎকালীন অখণ্ড ভারতের বাসিন্দা ছিল এবং তারা ভারতে বসবাসরত মূল জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ। তাদের প্রাগৈতিহাসিক গল্প ,সৃষ্টিতত্ত্বও এ কথার প্রমাণ দেয়। তারা যে সময় এদেশে আগমন করে তখন এদেশ নিশ্চয়ই মানুষবিহীন বা বিরান মরুভূমি ছিল না।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতে, কোনো দেশের তারাই আদিবাসী, যারা সে দেশেরই প্রাচীন অধিবাসীদের আধুনিক উত্তরপুরুষ।

> In modern times the term 'Aborigines' has been extended in signification and is used to indicate the inhabitants found in a country of its first discovery in contradiction to colonies or a new races, the time of whose introduction in to the country in unknown (Encyclopedia Brita mica, Vol. 1: 67).

মানবগোষ্ঠীর বির্বতনের ধারায়, সভ্যতার ক্রমবির্বতন, পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়, যে কোনো দেশের ভূমিজ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর তুলনায় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষগুলোই সে সমস্ত দেশের উপজাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মোটামুটিভাবে উপজাতীয় সমাজ বলতে সেসব সমাজকে বোঝানো হয়ে থাকে যাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কগুলো জ্ঞাতি সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যারা কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ অর্থে বর্তমানে পৃথিবীতে কোথাও কোনো উপজাতীয় সমাজ আর নেই (ত্রিপুরা,১৯৯৩:১৮)।

উপজাতি বলতে কী বোঝায় অথবা কাকে আমরা উপজাতি বলবো, এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিয়েছেন অধ্যাপক Andre Beteille। তাঁর মতে উপজাতি হলো:

> They are tribal people who have been associated with a particular historical tradition and now co-exist in the context of a particular political economy (Beteille, 1978 : IX).

Evens-Pritchard -এর মতে উপজাতি হলো:

> ...Hence these is no universal definition of the word tribe. A tribe according to me means a group of people having a distinct culture, living in a particular area with their traditional linguistic background (Evens-Pritchard ,1940:278-279.)

সাধারণ অর্থে উপজাতি বলতে বোঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যাদের মধ্যে দৈহিক-মানসিক এবং আবেগগত মিল রয়েছে। আবার কেউ কেউ একই বংশজাত মানবগোষ্ঠীকে উপজাতি বলে মনে করেন (আলী, ১৯৭৮:৪০৬)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী ফজলুর রশিদ খানের মতে, একই বংশোদ্ভূত, একই রক্ত ও আত্মার উত্তরাধিকারী বলে যারা নিজেদের মনে করতো, যারা দলের কোনো সদস্য নির্যাতিত হলে প্রতিশোধ নিতো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতো, তারাই উপজাতি (খান, ১৯৭৪:৩৫)। অপরপক্ষে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ টেলর-এর মতে, উপজাতি বলতে বোঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটা অঞ্চলে সংগঠিত এবং যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করে যে তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত। নৃবিজ্ঞানী কোহেল এবং ইয়ামস এর মতে, উপজাতি বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা তাদের জীবিকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ, উদ্যান, কৃষি ও পশুচারণের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ

(১) উপজাতি এমন একটি এলাকায় বসবাস করে যা প্রায় নির্দিষ্ট।

(২) উপজাতি একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী।

(৩) একটি উপজাতির অর্থনৈতিক জীবন প্রণালী, বা উপাদান সংগ্রহ কৌশল একই ধরনের।

(৪) উপজাতির সব সদস্যের মধ্যে একটা ঐক্যের অনুভূতি বিদ্যমান ও সংহতিবোধ তীব্র। রক্ত সম্পর্কে সচেতন (উদ্ধৃতঃ রহমান,১৯৮৮:১৩২)।

উপজাতি বিষয়ক সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাদেরকে আমরা যে কারণে বা অর্থে উপজাতি বলছি, তারা কেউ আর সে বৈশিষ্ট্য বহন করছে না। অর্থাৎ অযথা ভুল অর্থে কিছু মানুষকে উপজাতি বলে নিজেরাও বিতর্ক অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রাখছি। উপজাতি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন প্রণালী বা কৌশল এক নয়, কেউ আর খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার অর্থনীতি কেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহ করে না, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাদের বসবাস সীমাবদ্ধ নয়, তারা অভিন্ন সংস্কৃতির (চিরায়ত-খ্রিস্টান আলাদা সংস্কৃতি) অধিকারী নয়, তাদের মধ্যে মানসিক ও আবেগগত মিল নেই। সুতরাং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষকে উপজাতি বলাও কতোটুকু যৌক্তিকতা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

**বাংলাদেশের উপজাতি/আদিবাসী : প্রসঙ্গ সাঁওতাল**

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাস প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। এদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করতে হলে বরেন্দ্রভূমি তথা পুণ্ড্রবর্ধনপুর, পাহাড়পুর হবে তার উৎসভূমি, এখানেই মূল উপাদান খোঁজ করতে হবে। কারণ সভ্যতার পাদপীঠ এ উত্তরাঞ্চল। বৈদিক যুগে যখন ইতিহাস রচিত হয়েছে তখন সমগ্র ভারতের নদী অববাহিকায় জনবসতির কোনো চিহ্ন পাওয়া না গেলেও বাংলাদেশ সংলগ্ন মগধ ও চম্পা রাজ্যদ্বয়ে জনবসতি ছিল (চৌধুরী, ১৯৯৪:৪৮)। প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে রচিত বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণ গ্রন্থে 'বঙ্গ' জনপদ ও 'বঙ্গজাতি'র উল্লেখ পাওয়া যায় (আকন্দ, ১৯৯১:দশ)। প্রত্নপলীয় যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি থেকে প্রমাণিত হয়, এখন থেকে দশ-পনের হাজার বছর পূর্বেও বাংলার ভূমিতে মানুষের বসবাস ছিল (শামসুদ্দীন,১৯৯১:৪)। খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ সালে মৌর্য বংশের পতনের পর হতেই মোটামুটি প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে এ বিষয়ে বিশদ

আলোচনা আছে। বৈদিক যুগের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে বাংলায় বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পুণ্ড্র, শবর, কোল, ভীল, মেচ ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়, যাদেরকে এক কথায় 'নিষাদ', 'অন্ত্যজ', 'অস্পৃশ্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিককালের বহু প্রাচীন কোম বিভক্ত জন ও জনপদ, স্বজাতি অথবা বিজাতির দ্বন্দ্ব-মিলনে, সংঘর্ষে, সমন্বয়ে, বির্বতনের ধারাবাহিকতায় ইতিহাসের স্রোতে রূপান্তরিত হয়ে গড়ে ওঠেছে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি। সুতরাং বাঙালিরাই এদেশের আদিবাসী বা আদি বাসিন্দা, উপজাতিরা নয়। পক্ষান্তরে উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত প্রতিটি উপজাতি, বিশেষত সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা ইত্যাদির ইতিহাস সাম্প্রতিককালের, খুব বেশি হলে দুশো বছরের। তাদের আগমন প্রাক-ব্রিটিশ বা বিট্রিশ যুগে বলে সকল গবেষক একমত। পণ্ডিতগণের ধারণা অনুযায়ী বাংলা ও ভারত উপমহাদেশে সব রক্তধারার মানুষই বহিরাগত। প্রথমে নিগ্রোবটু, পরে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, আর্য, গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে ভারত ভূমিতে এবং পরে বাংলার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব নদীর খাত বেয়ে অথবা পাহাড়ি পথ ধরে বাংলার সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, এ অনার্যরাই আমাদের আদিপুরুষ (আহমদ, ১৯৯৪:১৮২)। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে বসবাসরত অনার্য জনগোষ্ঠীই বাঙালির পূর্বপুরুষ, এরাই এ দেশের আদিবাসী।

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে প্রাপ্ত উপজাতিসমূহ হলো যথাক্রমে বেদিয়া,বাহেলিয়া, ভুঁইহা (ভুঁইহার?), ঝিমিয়া, পান,পাশি, দোসাদ, রাঙ্গা, নাট, খাসি, কাছাড়ি, নাগেসিয়া, ভূমিজ, কোরা, থারু, মালপাহাড়িয়া, গারো, হাজং, খন্দ, লুসাই, হো, মাহালী, তুরী।

পক্ষান্তরে উপজাতীয় বিভিন্ন ভাষা অনুসারে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশের অধিবাসী যে ২০টি সমাজের নাম উল্লেখিত হয়েছে তারা হলো যথাক্রমে ভোটিয়া, চাকমা, দামাই, গুরুং, হদি, কুমি, খাসি, কুকি, লেপচা, লিমবু, মংগর, মেচ, ম্রো, মুন্ডা, নেওয়ার, উঁরাও, সাঁওতাল, সারকি, সুনুওয়ার, টিপরা।

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবাংলায় ৪১টি সম্প্রদায়ের নাম সিডিউল ট্রাইব হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এরমধ্যে সিডিউল ট্রাইব হিসেবে হো, কোরা, লোধা, খাড়িয়া, মালপাহাড়িয়া, মুণ্ডা, উঁরাও, সাঁওতালকে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সিডিউল কাস্ট তালিকাভুক্ত সম্প্রদায় হলো ১১ টি যেমন, ভুটিয়া, চাকমা, হারো, হাজং, লেপচা, মগ, মাহালী, মেচ, ম্রো, নাগাসিয়া, রাবহা প্রভৃতি। অন্যান্য সম্প্রদায়স্টুক্ত জনগোষ্ঠী হলো, আসুর, বাইগা, বানজারি, গোরিয়াত, কারমালি, খারওয়ার, খণ্ড, কিসান, কোরা, লোহার (লোহরা), মাহালী, পারহাইয়া, পাহাড়ী, সুরিয়া, সাভার (Troisi,1979,Vol.X: 32).

বাংলাদেশে বসবাসরত উপজাতীয়দের মধ্যে ১২টি উপজাতি যথা—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তংচংগ্যা, উসই, বম, খ্যাং, লুসাই, পাংখো, চাকমা ও খুমি দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অরণ্য জনপদে বসবাস করে আসছে (Maloney, 1984 : 10-12)। মারমা উপজাতির অপর সম্প্রদায় 'রাখাইন' কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে। উল্লিখিত উপজাতির অধিকাংশই আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম, পশ্চিমবাংলা রাজ্য ও বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে এদেশে এসে বসতি করে বংশপরম্পরায় যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে (Nandy ,1998 : 890)।

### সাঁওতালদের বাংলাদেশে আগমন ইতিহাস

সাঁওতালরা ভারতভূমির আদি বাসিন্দা নাকি বহিরাগত অথবা এ উপমহাদেশে তারা ঠিক কখন আগমন করেছিল, এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে এ কথা প্রায় সকল গবেষক

মনে করেন যে, সাঁওতালরা যে সময়ে ভারতে আগমন করেছিল, তখন অত্রাঞ্চল মনুষ্যবিহীন ছিল না। তবে সে সময়ের স্থায়ী বাসিন্দা কারা ছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য-প্রমাণের অভাব রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক ঐতিহাসিক, গবেষক এবং ব্রিটিশ প্রশাসকগণের মতে, সাঁওতালরা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। বহুবিধ কারণ ও যাযাবর মনোবৃত্তির কারণে সাঁওতালরা অত্রাঞ্চলে আগমন করে। সাঁওতালরা ব্রিট্রিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৭৮৪ সালে তিলকা মাঝির (মুর্মু) নেতৃত্বে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু এতে পরাজিত হয়। পরাজিত সাঁওতালরা ভয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। যাযাবর জীবন বেছে নেবার কারণে তাদের কোন স্থায়ী বসতি ছিল না। পরবর্তীতে ১৮৩৬ খ্রিস্টব্দে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে নির্বিঘ্নে বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী এলাকা নির্ধারণ করে দেন, যা সাঁওতাল পরগনা নামে পরিচিতি পায় (Dalton,1973: 208)। এর পূর্ব নাম ছিল 'দামান-ই-কোহ'। সাঁওতাল পরগনায় 'দিকু'-দের (ভিন্ন জাতি) আগমন বৃদ্ধি পায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছদ্মাবরণে খ্রীস্টান মিশন তাদের ধর্ম প্রচার শুরু করে। হিন্দু মহাজন ও সওদাগরদের অত্যাচার ও শোষণ বৃদ্ধি পায়। শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন সিধু-কানহুর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়। এসব বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য স্থাপন (বাস্কে, ১৯৯৯ : ২১৯-২২০)। আধুনিক মারণাস্ত্রে সমৃদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছে সাঁওতালরা পরাজিত হয় এবং ব্যর্থ বিদ্রোহের পর তারা সীমাহীন ও অবর্ণনীয় খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়ে জীবিকার সন্ধানে ব্রিটিশ বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর বাংলা, উড়িষ্যা, আসামে অতীব খাদ্য কষ্টে পতিত হয়ে সাঁওতালরা ১৯০১ সালে রাজশাহী তথা বরেন্দ্র অঞ্চলের উষর ও অনাবাদি পতিত জায়গাতে বসতি স্থাপন করে (Lacey,1931: 97)। হান্টারের মতে, ব্রিটিশ উপনিবেশিক প্রভুরা জনশক্তি হিসেবে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে এবং বাংলার জনবসতি শূন্য অনাবাদি উর্বর পতিত জমি চাষের জন্য উপজাতিদের ব্যবহার করা হতো (Datta,1979 : 224-226)। কার্টারের মতে, সাঁওতালরা বরেন্দ্র অঞ্চলের উঁচু উঁচু ভূমি-টিলা পরিষ্কার ও সমতল করে চাষের উপযুক্ত করে (Carter,1928 : 02)। ১৮৮০ সালে বরেন্দ্র অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সাঁওতাল মানুষ আগমন করে এবং ১৯২১ সাল পর্যন্ত মন্থর গতিতে এ ধারা অব্যাহত থাকে (সুলতানা,২০০২: ৩৯)।

১৯৫০ সালে ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৩৪২ নম্বর ধারার অধীনে পশ্চিম বাংলায় সাতটি উপজাতিকে স্বীকৃতি দেয়। উপজাতিগুলো হলো যথাক্রমে সাঁওতাল, উঁরাও, মুণ্ডা, লেপচা, ভুটিয়া, মেচ, ম্রো। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এ সাতটি উপজাতির সংখ্যা বলা হয় ১১.৫৬ লাখ। ১৯৫৬ সালের অধ্যাদেশে ভারতের Backward Classes Commission-এর সুপারিশে সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব হিসেবে প্রথমত উনিশটি (১৯) এবং পরে একচল্লিশটি (৪১) সম্প্রদায়ের মানুষের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এ বিষয়ে Swapan Kumar Banerjee, Ray Choudhury & Bidyut Kumar "Scheduled Tribes Population of West Bengal" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের মতে, ১৮৭২ সাল হতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মোট ৮০ বছরে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় সিডিউল ট্রাইব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ১৯০১-১৯৫১ সাল পর্যন্ত মোট ৫০ বছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৫৮.৩৭%, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৪.১৬%।

১৮৭২ সালে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক ভারত বর্ষে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১ সালে আদমশুমারি হয়। পাকিস্তান-বাংলাদেশ আমলে ১৯৫১, ১৯৬১ , ১৯৭৩, ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে আদমশুরারি ও কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারি হতে জানা যায়, সে সময়ে রাজশাহী জেলাতে মাত্র ০৫ জন সাঁওতাল ছিল (W.W.Hunter, 1975 : 48)। সমগ্র ভারতে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬,১১,৫১,৬৬৯

জন। ১৯৫৬ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী এ সময়ে সিডিউল ট্রাইব বলে পরিচিত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ২,২৫,১১,৮৫৪ জন বা ৬.২৩ % এবং পশ্চিমবাংলায় এ সংখ্যা ছিল ১৫,৬৬,৮৬৮ বা মোট জনসংখ্যার ৭% (Banerjee, Choudhury & Kumar, 1979 : 32)।

বাংলাদেশে সাঁওতালদের আগমন বা স্থানান্তরগমন প্রক্রিয়াকে বুঝতে আমরা নিম্নোক্ত টেবিলগুলো পর্যালোচনা করতে পারি।

**সারণি ০১ : ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসরত সিডিউল ট্রাইবের তালিকা**

| ক্রমিক নম্বর | প্রদেশের নাম | উপজাতির জনসংখ্যা | শতকরা হার(%) | মোট জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | অন্ধ্রপ্রদেশ | ১১,৪৯,৯১৯ | ৩.৬৮ | ৩,১২,৬৮,১৩৩ |
| ০২. | আসাম | ১৭,৬১,৪৩৪ | ১৯.৪৮ | ৯০,৪৩,৭০৭ |
| ০৩. | বিহার | ৩৮,৮০,০৯৭ | ১০.০০ | ৩,৮৭,৮৪,১৭২ |
| ০৪. | বোম্বে | ৩৭,৪৩,৪০৮ | ৭.৭৬ | ৪,৮২,৬৫,২২১ |
| ০৫. | কেরালা | ১,৪৩,৭৫৭ | ০.৯৯ | ১,৩৫,৪৯,১৮৮ |
| ০৬. | মধ্যপ্রদেশ | ৪৮,৪৪,১২৮ | ১৮.৫৮ | ২,৬০,৭১,৬৩৭ |
| ০৭. | মাদ্রাজ | ১,৩৬,৩৭৬ | ০.৪৫ | ২,৯৯,৭৪,৯৩৬ |
| ০৮. | মহীশুর | ৮০,৪০২ | ০.৪১ | ১,৯৪,০১,১৯৩ |
| ০৯. | উড়িষ্যা | ৩০,০৯,৫৮০ | ২০.৫৫ | ১,৪৬,৪৫,৯৪৬ |
| ১০. | পাঞ্জাব | ২,৬৬১ | ০.০২ | ১,৬১,৩৪,৮৯০ |
| ১১. | রাজস্থান | ১৭,৭৪,২৭৮ | ১১.১১ | ১,৫৯,৭০,৭৭৪ |
| ১২. | পশ্চিম বাঙলা | ১৫,৬৬,৮৬৮ | ৫.৯৬ | ২,৬৩,০১,৯৯২ |

Source: 'Report of the Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes: For the year 1956-57, Part-II' in *Bulletin of the Cultural Research Institute, Calcutta,* Vol.I,No.1 ; J.Troisi (Vol. X ) , 1979 : 32

**সারণি ২ : বরেন্দ্রভূমিতে আগত সাঁওতাল অভিবাসীর সংখ্যা**

| ক্রমিক নম্বর | সাল | রাজশাহী | দিনাজপুর | বগুড়া |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | ১৮৭২ | ০৫ | ১,০৩৯ | ৭৫ |
| ০২. | ১৮৮১ | ১৩৯ | ৮,২৪৭ | -- |
| ০৩. | ১৮৯১ | ৩২৯১ | ২২,১৭৬ | ৮৪ |
| ০৪. | ১৯০১ | ৬৪৮১ | ৪৮,৫৯০ | -- |
| ০৫. | ১৯১১ | ১৩৬৬৭ | ৭৪,৩৮১ | ৩৫৪৮ |
| ০৬. | ১৯২১ | ১৫০৮১ | ৫৩,৩৮০ | ৩৩০৮ |

সূত্র : Mallick,1993 : 135

**সারণি ৩ : সাঁওতাল পরগনার বাস্তত্যাগীর (স্বদেশত্যাগী)সংখ্যা**

| ক্রমিক নম্বর | সাল | বাস্তত্যাগীর সংখ্যা (জনে) |
|---|---|---|
| ০১. | ১৮৮১ | ২৯,৫১৫ |
| ০২. | ১৮৯১ | ৯৮,৮৪৮ |
| ০৩. | ১৯০১ | ২২৬০০৮ |
| ০৪. | ১৯১১ | ৩২১২৮৩ |
| ০৫. | ১৯২১ | ২০২৪৪৪ |

সূত্র : Mallick,1993 : 138

**সারণি ৪ : ১৯২১ সালের আদম শুমারিতে রাজশাহী বিভাগের সাঁওতাল জনসংখ্যার পরিসংখ্যান**

| ক্রমিক নম্বর | জেলার নাম | হিন্দু সাঁওতাল | চিরায়ত সাঁওতাল | মোট সাঁওতাল জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | রাজশাহী | ৫,১২৬ | ১৬,১৭৪ | ২১,৩০০ |
| ০২. | দিনাজপুর | ৩১,২৬২ | ৮৯,৩০৯ | ১,২০,৫৭১ |
| ০৩. | জলপাইগুড়ি | ৪,০৩৪ | ১৯,৯৫৪ | ২৩,৯৮৮ |
| ০৪. | দার্জিলিং | ১,২৯৪ | ২,৩১৩ | ৩,৬০৭ |
| ০৫. | রংপুর | ৪,৫৮৪ | ২,৮৯৭ | ৭,৪৮১ |
| ০৬. | বগুড়া | ৩,৮১১ | ৩,৩৭১ | ৭,১৮২ |
| ০৭. | পাবনা | ৬৬০ | ৩৮৫ | ১,০৪৫ |
| ০৮. | মালদহ | ৬৭৮ | ৭১,৪৬২ | ৭২,১৪০ |
| | মোট | ৫১৪৪৯ | ২০৫৮৬৫ | ২৫৭৩১৪ |

সূত্র : W.H.Thompson, *Census of India , 1921.* Vol. V, Bengal Part-II, 1923 : P. 173

উপর্যুক্ত সারণিসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 'সাঁওতাল পরগনা' হতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২,০২৪৪৪ জন সাঁওতাল স্বদেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশে আগমন করেছে, যাদেরকে বাস্তুত্যাগী বলা হয়। পক্ষান্তরে ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, এ সময়কাল পর্যন্ত তৎকালীন রাজশাহী বিভাগে (বর্তমান ভারতের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর সহ) সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২,৫৭,৩১৪ জন। অর্থাৎ ২৫৭৩১৪ জন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে অত্রাঞ্চলে আগমন করেছে। আদমশুমারিতে 'হিন্দু সাঁওতাল' বলে পরিচয় দানকারী ৫১,৪৪৯ জন 'হিন্দু সাঁওতাল' কে বাদ দিলে সারণি ২ এবং সারণি ৩-এ পরিদৃষ্ট সাঁওতালদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে তেমন পার্থক্য থাকে না। ধারণা করা যায়, হিন্দু মনোভাবাপন্ন সাঁওতালরা পরবর্তীতে নিজেদেরকে হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, কারণ এ সময়ে হিন্দু মিশনারিরা বেশ সক্রিয় ছিল। অথবা বলা যায়, সাঁওতাল পরগনা ছাড়াও অন্য কোনো অঞ্চল হতে কিছু সংখ্যক সাঁওতাল সে সময়ে রাজশাহী বিভাগে আগমন করেছিল। উপরিউক্ত ঐতিহাসিক সেন্সাস রিপোর্ট ও গবেষকদের উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে, সাঁওতালরা বিভিন্ন সময়ে জীবিকার সন্ধানে অত্রাঞ্চলে আগমন করেছে এবং বর্তমানে তারা বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হিসেবে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করছে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সর্বমোট জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে অন্য আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, আর তাহলো ১৯২১ সালে সাঁওতাল পরগনা ত্যাগকারী সাঁওতালদের মোট সংখ্যা ২,০২,৪৪৪ জন এবং সে সময়ে রাজশাহী বিভাগে বসবাসরত সাঁওতাল জনসংখ্যা ২,৫৭,৩১৪ জন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ১৯৯১ সালে (সর্বশেষ আদমশুমারি অনুসারে) এ সংখ্যা বেড়ে কয়েক গুণ হবার কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমগ্র বাংলাদেশে সাঁওতালদের সংখ্যা ২,০২,৭৪৪ জন এবং রাজশাহী বিভাগে এ সংখ্যা ১,৮৮,৩৫৯ জন (বিবিএস:১৯৯১)। অর্থাৎ প্রায় সত্তর(৭০) বছর পর এ সংখ্যা কমেছে প্রায় ৬৮,৯৫৫ জন। অনেকে অনুমান করেন যে, সাঁওতালরা যাযাবর মনোভাবাপন্ন জাতিগোষ্ঠী হবার কারণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা এদেশ ত্যাগ করে আদি বাসস্থান ভারতের সাঁওতাল পরগনা বা অন্য কোথাও গমন করেছে। আলোচ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়, সাঁওতালদের আদি উৎসভূমি হলো ভারত এবং গন্তব্যস্থল ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশে তারা অভিবাসী। কালের বিবর্তনে তারা আজ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশী কিন্তু আদিবাসী নয় ।

## উপসংহার

বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যেখানে শুধু একটি জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর কোথাও আদিবাসী বা উপজাতি বিষয়ক বিতর্ক না থাকলেও বাংলাদেশে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তা সৃষ্টি হয়েছে। কোনো দেশের মোট জনশক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই সে দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা নিয়ে বির্তকের ঝড় না তুলে বরং কিভাবে তা স্তিমিত করা যায়, সে চেষ্টাই করা উচিত। এ কারণে এখন সময় এসেছে এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার। এখন প্রয়োজন বাঙালি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী এবং উপজাতি শব্দ বিষয়ক বিতর্ক পরিহার করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোকে জাতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং পারস্পরিক সম্মান, আস্থা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে বিদ্যমান সমাজকাঠামোর আলোকে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা।

## সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি


Ali, Md. Ahsan (1989), *Social Change Among the Santals of Bangladesh : A Study of Cultural Isolation*, [Unpublished Ph.D Thesis], (Calcutta University:Department of Anthropology).

Archar, Mildred (1979), " The Folk-Tale in Santal Society" *The Santals- Readings in Tribal Life,* J. Troisi (ed), Vol. III , (New Delhi: Indian Social Institute).

Banerjee, Monoranjon(1964), *Primitive Men in India* (Ambala: The Indian Publications).

.....(1979), "The Santals" *The Santals- Readings in Tribal Life,*Vol. X, J.Troisi (ed*),* (New Delhi: Indian Social Institute).

Basu,K.K(1979) "Missionary Education in The Sonthal Parganas" *Santals-Readings in Tribal Life*. Vol.V, J.Troisi (ed*),* (New Delhi: Indian Social Institute).

Bell & H. Newby; ed. (1977) : *Doing Sociological Research* (London: Allen & Unwin).

Benedict,Ruth (1953*): Patterns of Culture* New York:New American Library

Berreeman Geral, et al (1969), *Cultural Anthropology Today (*California: Communication Research Machines, Inc.).

Bessaignet, Peirre (1960) "Tribes of the Northens Borders of East Pakistan" *Social Researches in East Pakistan,* Pierre Bessaignet (ed), ( Dacca: Asiatic Society of Bangladesh).

Canney, Maurice. A. (1979) "The Santals and their Folklore" in *The Santals - Readings in Tribal life,*Vol. III, J.Troisi(ed), (New Delhi: Indian Social Institute).

Chakrabarti, Ashis (1979) "Santhal Search for roots" *The Santals Readings in Tribal life*,Vol.V, J.Troisi(ed), (New Delhi: Indian Social Institute).

Chakravarti, M.R(1979): " Dermatoglyphics of the Santals of West Bengal" in J.Troisi (ed), *The Santals Readings in Tribal life*,Vol-VII: Language and Physical Characteristics. (New Delhi: Indian Social Institute).

Dalton , Edward Tuite (1971: *Tribal History of Eastern Indi,* Delhi: Cosmo Publication.

Datta,Kalikinkar (1979): " Original Records about the Santhal Insurrection of 1855" in J.Troisi (ed), The Santals- Readings in Tribal Life,Vol-III:Myth and Folklore. New Delhi: Indian Social Institute.

Datta-Majumder, Nobendu (1956): The Santal, A Study in Cultural Change. Calcutta : Govt. of India.

Fuchs, Steph : "Messianic Movement among the Santals" in J. Troisi (1979); ed.; *The Santals-Readings in Tribal Life,*Vol-VIII : Social Movement and Change. New Delhi: Indian Social Institute.

Gain,Phili (1993): Year of the Indigenous People-1993,Indigenous People of Bangladesh;Dhaka: Society for Environment and Human Development.

Hossain, Kazi Tobarak & Sadeque (1984): "The Santal of Rajshahi : A Study in Social and Cultural Change" in M.S.Qureshi(ed.), *Tribal Cultures in Bangladesh,* Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies.

Mallick, Samar Kumar (1991): ' Transformation of Santal Society : Prelude to Jharkhand'. Calcutta : Minerva Associates Publication Pvt.Ltd.

Mukherjea ,D & Charulal : " The Santal in a changing civilization" in J. Troisi(ed), 1979 *The Santals* , Readings in Tribal Life, Vol-VIII. Social Movement and Change. New Delhi: Indian Social Institute.

Naqavi,S.M. (1979): " Santal Murders " in J. Troisi (ed) , *The Santals*- Readings in Tribal Life, Vol-VI. Social Organization, New Delhi: Indian Social Institute.

O'Malley,L.S,S. : "The Santals" in J. Troisi (ed), *The Santals*- Readings 1979 in Tribal Life, Vol-IX Government and Other Reports; New Delhi: Indian Social Institute.

Orans,Martin (1964): *The Santal, A Tribe in Search of a Great Tradition.*Toranto, Canada: Wayne State University Press.

Rajput,A.B. (1965): *The Tribes of Chittagong Hill Tracts.* Karachi: Pakistan Publishers.

Risley,H.H. (1969): *People of India.* Calcutta:Oriental Books Corporations.

.....: " The Santals ", in J.Troisi; ed., (1979)*The Santals*- Readings in Tribal Life, Vol-X:General. New Delhi: Indian Social Institute.

Sen, Jyoti (1979) : " The Jharkhand Movement " in J. Troisi (ed), *The Santals* - Readings in Tribal Life , Vol - VIII . Social Movement and Change; .New Delhi: Indian Social Institute.

Srinivas M.N.et al., (1979): Field Worker and the Field Problems and Challanges in Sociological Investigations. Delhi : Oxford University Press.

Wallance,J.B & M. Harris (1988): "Anthropology and Development in Bangladesh", in Urban Anthropology.Vol.-18.

Wax,H.R. (1971) : Doing Fieldwork:Waring and Advices. Chicago : University of Chicago Press.

Weber, M.,(1968): Methodology of the Social Sciences. New York :Free Press.

William,Rhys thomas (1967): Field Methods in the Study of Culture. Chicago: Halt Rinehart & Winston.

Zubair, S.; ed. (1970): Race and Racialism, London: Tavistock.

আকন্দ, সফর আলী, সম্পা: (১৯৯১), :*বাঙালীর আত্মপরিচয়*, রাজশাহী : আই বি এস।

আরেফীন, খান হেলাল উদ্দিন,সম্পা:(১৯৯২), *বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

ইসলাম, এ,কে,এম, আমিনুল (১৯৮৫) মানব সভ্যতার ইতিহাস(আদিম যুগ) ।ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনী।

খান,এফ. আর. (১৯৭৪), *সমাজ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব*, ঢাকা : শিরিন পাবলিকেসন্স।

খান, হাফিজ রশীদ:সম্পা:(১৯৯৩),*বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্তে*, বান্দরবন:বাংলাদেশ উপজাতি আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ।

খীসা, প্রদীপ্ত (১৯৯৬), *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

গুহ, বিরজা শংকর (১৯৫০), *ভারতের জাতি পরিচয়*, দিল্লী : নৃতত্ত্ব বিভাগ।

ঘোষ, সুবোধ (১৯৯৫), *ভারতের আদিবাসী*, কলিকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।

চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ (১৯৯১), *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় পরিষদ*, রাঙ্গামাটি : স্থানীয় সরকার পরিষদ।

চাকমা, সুগত (১৯৯৩), *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি*, রাঙ্গামাটি : ট্রাইবাল অফিসার্স এসোসিয়েশন।

চৌধুরী, আনোয়ারুল্লাহ ও সাইফুর রশীদ (১৯৯৫), *নৃবিজ্ঞান: উদ্ভব-বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি*, ঢাকা :) বাংলা একাডেমী।

জলিল,মুহাম্মদ আব্দুল, (১৯৯১), *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ।

জুবেরী, মোহাম্মদ ইকবাল (১৯৯৮), 'বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ একাল-সেকাল ', *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*।

মমতাজুর রহমান ও অন্যান্য(সম্পা:), রাজশাহী : সম্পাদনা পরিষদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি।

ত্রিপুরা, প্রসান্ত, (১৯৯৩), 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান বিষয়ে', *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্তে*, হাফিজ রশীদ খাঁন (সম্পা:), বান্দরবান : বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ।

ফারুকী, রশীদ আল (১৯৯১), 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ', *বাঙালীর আত্মপরিচয়*। সফর আলী আকন্দ(সম্পা:), রাজশাহী : আইবিএস।

বর্মন, রেবতি, (১৯৮৭), *সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : নবপ্রকাশ ভবন।

বন্দোপ্যাধায়, রাখাল দাস, (১৩৬৮বাং), *বাঙালীর ইতিহাস*, কলিকাতা : নবভারত প্রকাশ।

বাস্কে , ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৯৬), *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, কলকাতা: পার্ল পাবলিশার্স।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র (১৯৭৪), *বাংলার ইতিহাস- প্রাচীন যুগ*, ১ম খন্ড; কলিকাতা : লেখক সমবায় সমিতি।

মল্লিক,সমর কুমার (১৯৮৮), 'উনবিংশ শতকে সাঁওতাল প্রতিবাদী আন্দোলনের স্বরূপ', *ইতিহাস অনুসন্ধান-০৩*। কলিকাতা : কে,পি,এ এন্ড কোম্পানী।

মিত্র,অশোক, সম্পা: (১৯৫৪), *মারে হাপারাম কো রেয়া: ক কথা (সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত)*, কলিকাতা :পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার।

রায়, অজয়, (১৩৭৬বাং), *বাঙলা ও বাঙালী*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী।

রায়, নীহাররঞ্জন, (১৩৮২বাং), *বাঙালীর ইতিহাস-আদি পর্ব*, কলিকাতা : লেখক সমবায় সমিতি।

শামসুদ্দীন, আবু জাফর (১৯৯১), 'বাঙালীর আত্মপরিচয় :নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে', *বাঙালীর আত্মপরিচয়*। সফর আলী আকন্দ(সম্পাঃ), রাজশাহী : আইবিএস।

সাত্তার, আব্দুস (১৯৬৬), *আরণ্য জনপদে*, ঢাকা : জলি বুকস।

সিংহ, রামাকান্ত (২০০২), *বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী* , ঢাকা : এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস।

সুর, অতুল (১৯৭৯), *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা : চ্যাটার্জী পাবলিশার্স।

সুলতানা, মোছাঃ আবিদা (২০০২), *সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রভাব : রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), আইবিএস : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল (১৯৯৪), 'বাঙালী জাতি', *বাংলাদেশ* (মুনসুর মুসা (সম্পাঃ), ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার গান : লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন

সুরঞ্জন রায়*

**Abstract:** Profullaranjan is especially renowned for his folk songs and still his songs are being sung in the vast tract in the middle-south part of the country. His poetic diction contains mystic, speculative, mythological, contemporary occasions both social and political, love and human agony. He composes about nine hundred songs and above hundred of them are in the dialect of Kalia in the District of Narail, where the rural life is portrayed with multiple problems. In this article, efforts have been made to discuss Profullaranjan's poetic development on the context of his songs which are particularly composed in dialect.

## ১. ভূমিকা

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস (১৯০০-১৯৭২) একজন লোককবি। যশোর অঞ্চলে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যে কবিয়াল বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫) ও জারিশিল্পী মোসলেম উদ্দিন বয়াতির (১৩১০-১৩৯৭) সঙ্গে তাঁর মিল অমিল দুটোই ছিলো। মিল হলো: সকলেই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অমিল হলো: তাঁরা ছিলেন আসরের, প্রফুল্লরঞ্জন আসরের বাইরের। মঞ্চে তাঁদের রচিত গান তাঁরা স্বকণ্ঠে পরিবেশন করেন, প্রফুল্লরঞ্জনের সে সুযোগ ছিলো না। তাঁরা উভয়েই ছিলেন পেশাদার। বেতারে উভয়ে গান পরিবেশনার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রফুল্লরঞ্জনের সে সুযোগ হয়নি। গান রচনা তাঁর অবসরের আনন্দ। এই আনন্দকে নির্মিতির সরল ও মুগ্ধকর কৌশলের জন্যে আমজনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর একটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মিল ছিলো—তাঁরা সকলেই বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা। তবে আঞ্চলিক বা লোকজ ভাষা গানে বিজয় সরকারের একটু-আধটু পদচারণা থাকলেও মোসলেম উদ্দিন এ পথ মাড়াননি। এই পথে প্রফুল্লরঞ্জনের গান মাটি-মানুষের জীবনলগ্ন বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণের মতো : 'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো-এক বাণী—/ আমি বহে আনি।' জীবনের যে বিষয়গুলো বাহুল্য বোধে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, সে বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গান রচনা করেছেন প্রফুল্লরঞ্জন, তাও কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষায়। কখনও পার্শ্ববর্তী জেলা গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশালের লোকজ ভাষায় দু-একটি গান রচিত হয়নি তা নয়। তবে ভাষিক সমস্যা কাটিয়ে উপস্থাপিত জীবন চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এই কবির সামগ্রিক রচনা অনাবিষ্কৃতির কারণে লোকজ জীবনের অন্তরালবর্তী ঘটনা থেকে আমাদের বঞ্চিত থাকতে হয়েছে। তবু যে তিনি আদৌ প্রকাশিত হননি তা নয়।

---

* সহকারী অধ্যাপক, শহীদ আঃ সালাম ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়, কালিয়া, নড়াইল।

তাঁর গানের সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মোট দুবার।[১] বিদগ্ধজনের সংগ্রহে ও সম্পাদকতাতেও তা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।[২] তাও উণকথায় এবং এষণাবিহীন। প্রতিনিধিত্ব করেছেন মধ্য-দক্ষিণ বঙ্গের বৃহৎ অঞ্চলের। অথচ অনালোচিত তিনি লোকান্তরিত হলেও বেঁচে আছেন শুধু তাঁর গানের জন্যে। লোকায়ত জীবন ছুঁয়ে, নানাভাবে, দেবারাধনায়; পূজা মণ্ডপে; হরিলুট অনুষ্ঠানে; মতুয়া সংঘে; ভাগবতের অনুষ্ঠানে; আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।

সংহত সমাজের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে হারিয়ে যায়। অর্থাৎ সমষ্টিকে নিয়েই তার অস্তিত্ব।[৩] বোধ করি এজন্যেই প্রফুল্লরঞ্জন নীরবে পার হয়ে গেলেন জন্ম শতবর্ষের সিঁড়ি। তবু যে কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হননি তা নয়। 'বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, কালিয়া শাখা'র উদ্‌যোগে একবার (২৭.০২.২০০০) ও কালিয়ার উৎসাহী লোকসঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি বর্গের চেষ্টায় ' সাধক কবি প্রফুল্ল গোঁসাই সঙ্গীত সম্মেলন ২০০৬ '-এ অর্ধশত শিল্পীদের গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আর একবার (১৭.০৭.২০০৬)। 'প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস' তাঁর কাগুজে নাম। অঞ্চল ভেদে তিনি ' প্রফুল্ল গোঁসাই' হিসেবে খ্যাত। ডাক নাম 'চকমোহন'। 'প্রফুল্লবাবু'ই তাঁর অধিক পরিচিতির বাহন । এযাবৎকালে সংগৃহীত তাঁর প্রায় ৯০০ গানের মধ্যে শুধু আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে শতাধিক।

## ২. কালিয়ার ভাষা

স্থানিক পরিচয়ে বাংলাদেশে যত গ্রামের প্রসিদ্ধি আছে নড়াইল জেলার কালিয়া তার একটি। ব্রিটিশ-ভারতে সমৃদ্ধ এই গ্রামটি বর্তমানে একটি উপজেলা। 'কালিয়া' নামটির উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য

---

[১] নরেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা চিঠি (২১আশ্বিন, ১৩৫৭) থেকে জানা যায়, ১৯৫০ সালে (বাংলা ১৩৫৭ সাল) *পল্লীগীতি কবি প্রফুল্লরঞ্জনের শারদীয়া পূজা অবদান* নামে এক ফর্মার ১০০০ কপি বই প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের সাহায্যে জানা গেছে, পুস্তিকাটি কালিয়াসহ খুলনা জেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে এবং পুজো প্যান্ডেলে বিক্রি হতো। দ্বিতীয়টি সংকলন আকারে প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ, ভারত থেকে। এর নাম *প্রফুল্ল গীতিমালা* (নদীয়া: শিল্পমালা, ১৪০০ সাল)। ২৬৯টি গানের মধ্যে প্রফুল্লরঞ্জনের ভনিতায় বিজয় সরকারের একটি গানও এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

[২] ১৯৫৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যে সব গ্রন্থে প্রফুল্লরঞ্জনের গান সংকলিত হয়েছে : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৮), পৃ. ১০৩৮-১০৩৯। 'বীরভূম জেলা হইতে সংগৃহীত গান' হিসেবে গানের কথা ও পঙ্‌ক্তি পরিবর্তন করে গানটি প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখিত গানটি: ও দারুন নির্দয়ের সাথে রে/ পিরীতি করিলাম না বুঝিয়া। প্রফুল্লরঞ্জনকৃত: এমন নিপাষাণের সাথে রে/ এমন অকরুণের সাথে রে আমি পীরিতি করিলাম না বুঝিয়া। [রচনা কাল-৩৩/৭/৫১]; জসীমউদ্‌দীন, *স্মৃতিরপট* (ঢাকা: পলাশ প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২৫ মার্চ ২০০০), পৃ. ১২১। গ্রন্থে উল্লিখিত গানটিতে প্রফুল্লরঞ্জনের ভনিতা ছাড়া বাকি টুকু শিল্পীকৃত বলে মনে হয়। হাজেরা বিবির গাওয়া গান: "আমার ভাব চিঠিখান লইয়ারে/ যারে কোকিল প্রাণ বন্ধুয়ার দেশে/ উড়ে যারে কালো কোকিল উজান বাতাসেরে/ কোকিল নিরাল বাতাসে।" প্রফুল্লরঞ্জনের গান: "আমার প্রেম চিঠিখান নিয়ারে/ মনের ভাব চিঠিখান নিয়ারে/ তুই যারে কোকিল প্রাণ বন্ধুয়ার দেশে/ একবার উড়ে যারে প্রাণ কোকিলা/ নিরালা বাতাসে। [রচনাকাল ৫/৮/৫১]; মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ১১৩-১১৬। সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ চারটি গান প্রকাশিত হলেও প্রফুল্লরঞ্জনের গানের শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে। এ জামান সম্পাদিত, *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার*, প্রথম খণ্ড (যশোর, ১৯৯৮), পৃ.২৩০-২৩২। প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের কাছের মানুষ নিতাইপদ বিশ্বাসের *'পল্লীকবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস'* জীবনী ও গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (যশোর: ২৭ আগস্ট, ১৯৯৯),পৃ. ৯১-৯২, পাঁচটি গান প্রকাশিত হয়েছে। মহসিন হোসাইন, *নড়াইল জেলা সমীক্ষা ও স্থাননাম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মে ২০০১), পৃ. ২০৬-০৭, ২২৩-২৪, দুটো বিচ্ছেদ ও একটি মুর্শিদি গান প্রকাশিত হয়েছে। দুলাল রায়, *কালীগঙ্গা থেকে কালিয়া* (ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ৪৪, উপন্যাসে একটি গান প্রকাশিত হয়েছে।

[৩] শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য* প্রথমখণ্ড (৫ম সং: কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪),পৃ.৩।

পাওয়া যায়নি, তবে অনুমান করা যায়, কালিগঙ্গা নদীর ভরাট জমিতে যে জনপদ গড়ে ওঠে তাই-ই কালিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে।[৪] এই কালিয়া নামের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে বড়কালিয়া, ছোটকালিয়া, রামনগর, বেন্দা প্রভৃতি গ্রামের সমৃদ্ধি। নীল বিদ্রোহের সময় ১৮৬১ সালে নড়াইলে মহকুমা, আর জমিদার ও প্রজার বিবাদ থেকে কালিয়াতে ১৮৬৭ সালে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫]

৩১৭.৬৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ১৩টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার সমন্বয়ে গঠিত কালিয়া উপজেলার ভাষা প্রতিবেশী অন্যান্য এলাকার থেকে অনেক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। নিম্নে কয়েকটি শব্দের আঞ্চলিক রূপান্তর দেখানো হলো:

| | | |
|---|---|---|
| সকল—সগোল | পর্যন্ত—তামাতি | বেঁধে—বান্ধে |
| যখন—যহন | থাকিস—থাহিস | বুঝেছে—বুজতিছে |
| যেতে—যাতি | অজীর্ণ—অজেন্য | লজ্জা—নজ্জা |
| শ্রদ্ধা—ছেদ্দা | সময়—সোমায় | পরবার—পিন্দা |
| পড়লো—প'লো | হলেও—অলিও | ক্ষণে—খ্যানে |
| লোক—নোক | তাইতে—তাইতি | চূর্ণবিচূর্ণ—চুরমাটি |
| তবু—তেমু | থোওয়া—থোবা | কৃষ্ণ—কিষ্টো |
| ঠেকবি—ঠেকপি | কেডা—খেডা | উনান—আহা |
| এখন—এ্যাহোন, এ্যান্নে | কমটা—কমডা | এটা—এডা |
| কোথায়—কোবায় | দুইখান—দুইহেন | ওটা—ওডা |
| পড়েছে—পড়িছে | হয়েছে—হইছে | একলা—এ্যায়লা |
| বললে—কলি | টাকা—টাহা | রকম—রহোম |
| দেখাতে—দ্যাহাতি | কিসে—কিসিতি | ভালোবাসা—ভালোফাসা |
| দেখে—দেহি | এজন্যে—এজম্বে | ছোট বাচ্চা—ঝিত্পালা |

তাছাড়া, ক্রিয়াপদের শেষে নেতিবাচক শব্দ 'না' স্থলে 'নানে', যেমন, যাবনা> যাবনানে, খাবনা>খাবনানে, পাবিনা>পাবিনানে, করবোনা> করবোনানে ইত্যাদি কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য।

আরও কিছু উদাহরণ:

> কয় বছর আগের কতা, কা'লের বিলি রূপে সাদুর বাড়ির পচ্চিম ফাড়ে আমি আর ছোট দাদু গিছি মাছ দরতি। আমাগে সাতে ছেলো অ্যাটটা কুটি ডুঙ্গা। বিলির মদ্দিহানে যাইয়ে দেহি মাছ আর মাছ। ফুটি, টাহি, মজগুর যেহানে সেহানে খলবল খলবল অরতিছে। ইডা দরি কি উডা দরি, ফুটি দরি কি টাহি দরি। এর মদ্দি আমাগে ডুল নাগে ডুঙ্গা উলটে যাইয়ে মরার কায়দা।

কালিয়া তথা নড়াইলের আঞ্চলিক ভাষা আজ মৃতপ্রায়। আধুনিক শিক্ষার অভিঘাতে এই ভাষায় অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোক ছাড়া শিক্ষিক, অর্ধশিক্ষিত লোকেরা কথা বলে না। এ অবস্থায় প্রফুল্লরঞ্জনের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গানগুলো শুধুমাত্র কালিয়া অঞ্চলের নয়, বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অঞ্চলের উপভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

[৪] মহসিন হোসাইন, *কালিয়া উপজেলার ইতিহাস-সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড* (কালিয়া: কালিয়া উপজেলা পরিষদ, ১৯৮৭), পৃ.১; *কালিয়া*, ত্রৈমাসিক পল্লীবার্ত্তা, প্রথম বর্ষ, মাঘ ১৩৩২, পৃ. ১৩।

[৫] *কালিয়া*, পৃ. ১৭-১৮।

### ৩. পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিত, শিক্ষা ও গান রচনা

ব্রিটিশ-ভারতের বিখ্যাত জনপদ কালিয়া থানার (বর্তমানে উপজেলা) ছোট কালিয়া গ্রামে ১৯০০ সালে তাঁর জন্ম।[৬] নমঃশূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি তখনকার বৈদ্য-কায়স্থ অধ্যুষিত কালিয়ায় প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা গগনচন্দ্র বিশ্বাস, মাতা লক্ষ্মীরানী বিশ্বাস। খুব অভাবের সংসারে শাক-পাতা বেচে সংসার চলতো গগনের। মা লোকের বাড়ি ধান ভানতেন। এরকম অভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠা প্রফুল্লরঞ্জনের বিদ্যারম্ভ হয় গ্রামের তিনে গুরু মশাইয়ের পাঠশালায়। অতঃপর গিরিধর সেন (১২৩০-১২৮০) ও পণ্ডিত কালীকমল দাশের (১২৩৩-১২৯৯) প্রতিষ্ঠিত কালিয়া এম.ই. স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।[৭] এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন। প্রথম বর্ষ পড়ে দ্বিতীয় বর্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার আগেই তাঁর লেখা-পড়ার পাট চুকে যায়। শোনা যায়, কলেজে পড়ার সময় প্রফুল্লরঞ্জনের আগ্রহ দেখে পণ্ডিত মশাই গান রচনায় অনুপ্রেরণা দিতেন।

প্রফুল্লরঞ্জনের সাঙ্গীতিক ভুবন নির্মাণ করতে যাঁর গান বিশেষ সাহায্য করে, তিনি ছোট কালিয়ার পাশের গ্রাম মির্জাপুরের অধিবাসী কবি গোপাল ফৌজদার।[৮] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও এ কবি কালীসাধনা ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক অনেক গান লিখেছেন। তার মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর সংবলিত অনেক গানের প্রভাব প্রফুল্লরঞ্জনে দুর্নিরীক্ষ্য নয়।[৯] গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে প্রফুল্লরঞ্জন রচিত সাধনতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পারমার্থিকতত্ত্ব, কর্মযোগ, বস্তুভেদ, গুহ্যার্থ, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পঞ্চ ম-কারতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব বিষয়ে এরকম পনর জোড়া গান পাওয়া গেছে। মজার বিষয়, গানের সীমিত পরিসরে জিজ্ঞাসা ও উত্তরে কোনো জটিলতা নেই। সহজ-সরল ভাষায় তত্ত্বভেদ করা হয়েছে। তাঁর গানে প্রদত্ত তারিখ দেখে মনে হয়, ১৩৩৬ সালের দিকে গোপাল ফৌজদারের গানের উত্তর রচনার মাধ্যমে গান রচনার সূত্রপাত ; নাকি তারও আগে থেকে গানের মক্‌শো চলতো সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে দীর্ঘ ষোল বছর পরে (২৭ভাদ্র, ১৩৫২) তাঁর অনুপ্রেরক গোপাল ফৌজদারের উদ্দেশ্যে গান রচনা

---

[৬] সাক্ষাৎকার: *কালীপদ হালদার* (৬৭), দিগরাজ, মংলা, বাগেরহাট, তাং ২১.১০.০২। প্রফুল্লরঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন তাঁর জন্ম ১৯০০ সালে।

[৭] কালিয়ার গিরিধর সেন ও বেন্দা গ্রামের কালীকমল দাশ ১৮৬৫ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিধর সেনের ছোট ভাই বংশীধর সেন স্কুলটি মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করেন। *কালিয়া*, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৩ বৈশাখ, পৃ. ২৪-২৫।

[৮] মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৮),পৃ.১২৩।

[৯]

| **গোপাল ফৌজদারের গান** | **প্রফুল্লরঞ্জনের উত্তর** |
|---|---|
| মনের মানুষ বলো যারে কোনখানে সে বিরাজ করে | মনের মানুষ বল যারে, বলবো কোথায় বিরাজ করে |
| অযোনি সম্ভবা কিংবা জন্ম জননী জঠরে? | সে অনিত্য সুশাশ্বত পরিব্যাপ্ত চরাচরে। |
| আট কুঠরি সাত তালার সে ঘর | জন্ম-মৃত্যু তার কভু না হয় |
| মনের মানুষ বিরাজে তার কোন তালার উপর | অনাদি অনন্ত তার চির পরিচয় |
| সে তালাটি বা কোন পদ্মের উপর পদ্মটি বা কি রঙ ধরে? | অনিত্যের মাঝে নিত্য রয় অভিন্ন যোগ সূত্র ধরে। |
| কয়টি দল সে পদ্মের অধরে | অষ্ট কোঠা সপ্ত তালার ঘর |
| কয় অক্ষর বীজ বিরাজে তার কর্ণিকা 'পরে | মনের মানুষ বিরাজ করে সপ্ত তালার পর |
| বল, সে বীজ বা কোন বাহন পরে তার নিত্যতত্ত্ব বল মোরে ? | সে তালা সহস্রার পদ্মের পর সুনির্মল শুভ্র রঙ ধরে। |
| গোপল বলে জানতে বড় সাধ | দশ শতদল পদ্মের আধারে |
| ঘটেনা ঘটেনা হরি হরিসে বিষাদ | অঙ্কারৎ পঞ্চাশৎ বীজ তার কর্ণিকা 'পরে- |
| এবার পূর্ণ কর মানুষের সাধ দেখ ডুবিনা যেন বিষাদ সাগরে। | তথায় মনের মানুষ বিরাজ করে সুন্দর মন্দির ঘরে। |
| | প্রফুল্ল কয় বিন্দু ঠিক করে |
| | ঊর্ধ্বরেতা হলে মানুষ ধরা দেয় তারে |
| | শেষে মানুষময় বিশ্ব নেহারে ডোবে না বিষাদ সাগরে। |

করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।[১০] প্রফুল্লরঞ্জনের গানে গোপাল ফৌজদারের প্রভাব থাকলেও মহসিন হোসাইন প্রফুল্লরঞ্জনকে কবিয়াল তারক সরকারের (১২৪৫-১৩১২) ভাবশিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

## ৪. কর্মজীবন

গান রচনা তাঁর নেশা হলেও পেশায় ছিলেন শিক্ষক। অকৃতদার তিনি প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেন খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বিশ্বম্ভর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আর শেষ করেন একই জেলার বর্তমান তেরখাদা উপজেলার ইখড়ি-কাটেংগা এফ.এইচ. ইনস্টিটিউশনে। মাঝে বৎসরখানেক শুকদাঁড়া-আমতলা স্কুল প্রতিষ্ঠায় এবং দীর্ঘদিন বাদে ১৯৫১-৫২ সালের দিকে মংলা উপজেলার দিগরাজ এম. ই. স্কুলে কাজ করেন। স্বল্প সময়ে দিগরাজ অঞ্চলে তিনি এত বেশি পরিচিতি পান যে, তাঁর গান আজও মানুষের মুখে মুখে ঘোরে।[১২]

১৯৫৩ সালে ১ ফেব্রুয়ারিতে যশোরের মশিয়াহাটির কাছে কুলটিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এ সময় জামাকাপড়ের জীর্ণতা কাটাবার জন্যে তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র নরেন্দ্রনাথ রায়কে টাকা চেয়ে চিঠি লেখেন। এই নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'গরীবের মেয়ে' ও 'বাস্তুহারা ' নাটক রচনা করলে প্রফুল্লরঞ্জন নাটক দু'টোর জন্যে গান রচনা করেন।[১৩] ১৯৭১ সালে শরণার্থী হয়ে ভারত যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ইখড়ি-কাটেংগা এফ.এইচ. ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। ভারত থেকে ফিরে আমাশয় রোগে আক্রান্ত কবি ১৯৭২ সালে (১৩৭৯ সালের ৫ই বৈশাখ) মৃত্যুবরণ করেন।[১৪] ১৯৪৫

---

১০

ধন্য মানুষ অবতীর্ণ মৃঝাপুরে
গোপাল গোসাই।
এমন পূর্ণ মানুষ এল দেশে
এদেশের ভাগ্যের সীমা নাই।
সত্য ধর্ম্ম নাম প্রচারিতে
পার্ষদ ভক্তেরা আসেন জগতের হিতে।
এবার কবি এলেন সুপ্রভাতে
তত্ত্ব সুধা করতে যাচাই।
নন্দ যশোমতীর সাধনায়
পুত্র হয়ে এলেন কৃষ্ণ দ্বাপরের লীলায়
সেই সাধনায় গোপাল ধন পায়
তীর্থ মাতা-পিতা নিমাই।
গৃহ ধর্ম্ম শুদ্ধ কুলাচার
দারা পুত্র কন্যা নিয়ে করিলেন বিস্তার
চিত্ত শুদ্ধ যোগীর আচার
চরিত্র আর সঙ্গীতে পাই।
প্রফুল্ল কয় সে অঙ্গের বাতাস
ভাগ্যবন্তে পেয়েছে তার সঙ্গে করে বাস
আমি হবো তারি দাসানুদাস
আমার তো সে যোগ্যতা নাই।

[১১] মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৮), পৃ. ১১৩।

[১২] প্রভাত কুমার মল্লিক,"বিশ্বম্ভর মল্লিক ও তাঁর বিদ্যালয়", *কিশলয়*, বয়ারভাঙ্গা বিশ্বম্ভর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বার্ষিকী, ১ বৈশাখ, ১৪০৯,পৃ. ১৩-১৫; স্কুলে যোগদানের তারিখ: ১ এপ্রিল ১৯৬৪; সাক্ষাৎকার: আশুতোষ মল্লিক, বয়ারভাঙ্গা, বটিয়াঘাটা,খুলনা, ০৯.১১.০২; নরেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা চিঠি, তারিখ: ২৪আশ্বিন ১৩৫৮; সাক্ষাৎকার: কালীপদ হালদার, ২১ - ১০-২০০২।

[১৩] নরেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা চিঠি, তারিখ: ২১ মাঘ, ১৩৫৯; সাক্ষাৎকার: নরেন্দ্রনাথ রায়, বয়ারভাঙ্গা,বটিয়াঘাটা, তারিখ: ৯-১১-০২। রনেন্দ্রনাথ তাঁর পিতা নরেন্দ্রনাথকে লেখা ৩৫ খান চিঠি বর্তমান নিবন্ধকারকে দিয়েছেন। অনেক গুলো চিঠিতে প্রফুল্লরঞ্জন নরেন্দ্রনাথের নাটকের জন্যে গান লিখে পাঠিয়ে ছিলেন।

[১৪] প্রফুল্লরঞ্জনের জন্ম ও মৃত্যু সাল নিয়ে মতানৈক্য আছে। লোকগবেষক মহসিন হোসাইন *'বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি'* গ্রন্থে (পৃ.১১৪) জন্ম ১৩০৭ ও মৃত্যু ১৩৮১ সাল মোতাবেক ১৯০১-১৯৭৫ বলেছেন। এ জামান সম্পাদিত *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার*, প্রথম খণ্ড (১৯৯৮), পৃ. ২৩২] গ্রন্থে নিতাইদাস বিশ্বাস জন্ম ১৯১০, মৃত্যু ১৯৭২ মোতাবেক বাংলা ১৩১৬ জন্ম, ১৩৭৯ সালের ৫ বৈশাখ মৃত্যু দিন বলে উল্লেখ করেছেন।

সালের দিকে কালিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম.বি. একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রফুল্লরঞ্জনকে সোনার দোয়াত-কলম দিয়ে পুরস্কৃত করেন এবং "পল্লিকবি" বলে আখ্যায়িত করেন ।[১৫]

### ৫. আঞ্চলিক ভাষার গানের বিষয় বিন্যাস

বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা প্রফুল্লরঞ্জন প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ, ভাটিয়ালি, পল্লিগীতি, তাত্ত্বিক, যোগসাধনা, কালীসাধনা, সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয় ছাড়াও শুধু আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করেন শতাধিক গান। তাঁর গানের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কবিয়াল বিজয় সরকারের (১৯০৩-১৯৮৫) নিরীক্ষাধর্মী উচ্চারণ :

> ভাব ভাটিয়াল তত্ত্ব আধ্যাত্মিক/ তামসিক আর রাজসিক সাত্ত্বিক/ বিরহ বিচ্ছেদ গীতি আরো সামাজিক/ আমরা শুনে তাঁর রচিত কমিক/ হাসির মঞ্চে আছাড় খাই ।[১৬]

বিজয় সরকার কথিত 'কমিক' গানকে আমরা আঞ্চলিক ভাষার গান বলেছি। কেননা গানের মধ্যে হাস্যরসের চিরায়ত আবেদন থাকলেও, ভাষাগত দিক থেকে এ গান প্রতিনিধিত্ব করছে একটি বিশেষ অঞ্চলের। হাস্যরস সৃষ্টিতে লোক ভাষা প্রয়োগ দেখানোর উদ্দেশ্যে নাটকে ঢাকা-বরিশাল অঞ্চলের গ্রামীণ উচ্চারণ প্রযুক্ত হলেও, প্রফুল্লরঞ্জনের গান সেরকম উদ্দেশ্যপ্রসূত নয়; বরং জীবননিষ্ঠ এবং নিষ্ঠাবান শিল্পীরই দক্ষতার ছাপ পড়েছে এ ভাষা প্রয়োগে।

আমরা জানি আঞ্চলিক ও লোকজ বৈশিষ্ট্যের কারণে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য তৈরি হয়, সে পার্থক্য নিসর্গগত, সংস্কৃতিগত কিংবা ভাষাগত হতে পারে। ভাষাগত পার্থক্য ১০/১২ কিলোমিটারের ব্যবধানে বোঝা যায়, বিশেষত লোকজ ভাষা। এ ভাষা এমনি যে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, কিছুটা হলেও পার্থক্য থাকবেই। এ পার্থক্য শুধু মাত্র ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার ওপর, গ্রামীণ শব্দ ও প্রয়োগরীতির ওপর নির্ভর করে না, সামাজিক অবস্থান, পেশা, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ওপরও নির্ভর করে। তাছাড়া, একটি বিস্তীর্ণ জনসমষ্টি একটি ভাষায় কথা বললে, তাদের শব্দ, উচ্চারণ, ইডিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কম-বেশি পার্থক্য তৈরি হয়। শব্দভাণ্ডার, ক্রিয়াপদ, বাগধারা ইত্যাদিতে অঞ্চল ভেদে যে পার্থক্য তৈরি হয়, তাকে আঞ্চলিক ভাষা,[১৭] আর সেই ভাষায় রচিত গানকে আঞ্চলিক ভাষার গান বলবো। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে যেমন একটি অঞ্চলের জীবন ধরা পড়েছে, তেমনি ভাষাটিও জীবন ব্যবস্থার মতই সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষা ও জীবনধারা মিলে গানগুলোর মধ্যে সে অঞ্চলের, বিশেষত নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মানুষের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার যে প্রকাশ

---

জন্মতারিখ সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও মৃত্যু সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এবং তার সমাধান মেলে বিজয় সরকারের গানে:

> তের শত উনআশি সাল, নতুন বর্ষ প্রথম মাসকাল,/ দোকান তুলে নৌকা খুলে তুলে দিল পাল,/ গোঁসাই পাড়ি দিল সকাল সকাল ভাগ্যের বলিহারী যাই।

বিজয় সরকার, *বিজয় গীতি* (২য় সং; কেউটিয়া: লোককবি প্রকাশন, ১৪০৪), পৃ. ১৭২।

[১৫] এ জামান সম্পাদিত, *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার*, প্রথম খণ্ড (যশোর: ২৭ অক্টোবর ১৯৯৮), পৃ. ২৩২।

[১৬] বিজয় সরকার, *বিজয় গীতি*, পৃ. ১৭২।

[১৭] পল্লব সেনগুপ্ত, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ২৯৩-২৯৪।

ঘটেছে তার মধ্যেই প্রোথিত আছে সেই অঞ্চলের আত্মপরিচয়ের শেকড়।[১৮] এই সূত্র ধরে মনে রাখতে হবে ভাষা, বিশেষত লৌকিক ভাষা, তা সে অপরাধ জগতের হোক, কিংবা গালাগালি বা ঝগড়ারই হোক না কেন, তার প্রায়োগিক দিকটা লোকভাষার যেমন একটি উপকরণ, তেমনি প্রফুল্লরঞ্জনের আঞ্চলিক ভাষার গানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

গ্রাম্য ভাষায় রচিত সাধারণ মানুষের জীবনলগ্ন এই গানগুলোতে যে গালাগালির ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা slanguage-এর মতো হলেও তাদের জীবনে এটিই স্বাভাবিক। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর রাগ-দ্বেষ, মান-অভিমান ও ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যবহৃত ভাষা গালাগালির ভাষা হলেও বেশ উপভোগ্য। কিছু গালাগালির শব্দ, যেমন, ছাইকপালী, চুলোমুখী, জাতবারানি, কালসাপিনী, শালীরবিটি, নিব্বুংশে, মেচিমুহো, ম্যান্তামুখো, চুলবেলী, মুখ আন্ধারি, ছ্যানাল, নচ্ছারী, খাকসো নোক, আনক্কী, শগুন, মানুষ শুগী শাঙ্খেনী, রুগোতে তুই মর দিন ইত্যাদি শব্দ গানের বিষয় বস্তুর সঙ্গে অনুষঙ্গ জীবনের কথকতায় এমনভাবে মিশে গেছে যে, ভদ্রস্থ অন্য শব্দের প্রয়োগ হতো অস্বাভাবিক।

লোকজ ভাষায় রচিত এ গানে স্বামী-স্ত্রীর নিত্যদিনের আচার-আচরণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পাশাপাশি জীবনের শখ-আহ্লাদ, আশা-ভালোবাসা, আনন্দ-বেদনাসহ অভ্যাস ও বদ অভ্যাসের কেচ্ছা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া, বহুরকম সমস্যার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে এই গানে।

বাংলা সাহিত্যের কথা শিল্পে নিচু তলার মানুষের জীবন ব্যবস্থা, আচার-আচরণ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় চিত্রিত হলেও, এমনকি কবিতাতেও সে জীবন মূর্ত হয়ে উঠলেও, গানে এমন জীবন চিত্রের উপস্থাপন আমরা কদাচিৎ দেখতে পেয়েছি। বোধ করি, এদিক থেকে প্রফুল্লরঞ্জনই অনন্য।

প্রফুল্লরঞ্জনের গানে যে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তারা খেটে খাওয়া মানুষ, শোষণক্লিষ্ট মানুষ, এবং এই মানুষই লোকগীতির ধারক-বাহক। ঠিক এইজন্যেই লোকগীতিতে এইসব মানুষের যন্ত্রণা, আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার ছাপ অনিবার্যভাবে বর্তমান। এদিক থেকে লোকগীতি সমাজের চালচিত্রের উন্মোচন করে না শুধু, গ্রামীণ লোকসমাজ কর্তৃক পায় স্বীকৃতি ও স্বতঃস্ফূর্ততা। আর সঙ্গত কারণে গানের বিষয়বস্তু ও ভাষা তো লোকসমাজের হবেই, পাশাপাশি থাকতে হবে আঞ্চলিক সুর ও ধ্বনিকাঠামো। তাবৎ লোকসঙ্গীতের বেলায় বিষয়টি অপরিহার্য না হলেও, আঞ্চলিক ভাষার গানে বিষয়টি মান্যতার দাবি রাখে।

প্রফুল্লরঞ্জনের আঞ্চলিক ভাষার গানে বিষয় ও শব্দের বিন্যাস হাসির উদ্রেক করলেও, সারল্যে ভরা জীবনের কথকতা নিত্যদিনের বিষয় বলেই মনে হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্যানভাসে আঁকা চিরচেনা মানুষের ছবি ভাষিক উপস্থাপন গুণে জীবনের তলা অবধি দেখা যায়। এবং জানা যায় জীবনাচরণের নানা অনুষঙ্গ। দাঁতে গুঁড়ো নেওয়ার দৃশ্য ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে হেসে কথা না বলার অনুযোগ, বাগানে একলা দার কুড়োতে যাওয়ার বিপত্তি, স্ত্রীর মুখ আন্ধারি যুত, বৌয়ের আদব-কায়দা শেখানো, একলা তিনটে ইলিশ খাওয়ার ইচ্ছে, বারুণীর মেলায় যাবার আবদার, কলতলায় পড়ে কলস ভাঙায় শ্বাশুড়ির বকুনি, পুজোয় ভালো শাড়ি পাবার বায়না প্রভৃতি প্রসঙ্গ অত্যন্ত সাধারণ হলেও প্রফুল্লরঞ্জন জীবনের তলা থেকে খুঁচে এ বিষয়গুলো সাঙ্গীতিক রূপ দিয়েছেন।

তাছাড়া, চুলকানি, ম্যালেরিয়া, অম্বলের ব্যথ্যাসহ অসমবয়সী স্বামীর হাতে পড়ে যুবতী রমণীর মানসিক ক্রিয়া, ভাজা পোড়া, মিষ্টি ও মাছের প্রতি আগ্রহ, কন্ট্রোলের খাকশো শাড়ি, রোগাক্রান্ত স্বামীর মৃত্যু কামনা, খসমের বাওয়ালে যাওয়া, উকুনের যন্ত্রণা, হিন্দুস্তানে জায়গা রাখা প্রসঙ্গ,

---

[১৮] আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি-বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ২২।

শিয়ালের হাঁস ধরা, বাদা বনে পাংগাস মারতে যাওয়া এবং জোঁকের ভয়ে কী অবস্থা হয়, তার আলাদা আলাদা ছবি এঁকেছেন প্রফুল্লরঞ্জন। এভাবে বহুমাত্রিক বিষয়ে বিন্যস্ত হয়েছে তাঁর গান।

### ৬. গানের পটভূমি

শুধু সংগীত নয়, যে কোন শিল্পের নির্মাণ ক্ষেত্র কিন্তু সমাজ। তাই বলা যায়, বস্তু জগৎ ও মানব সমাজই সঙ্গীতের উৎসভূমি। আর সঙ্গীত, বিশেষ করে লোকসঙ্গীত, সমাজ দেহের শিরা-উপশিরা জুড়ে এমনভাবে প্রবাহিত যে, তা নিছক আমোদ প্রমোদের বিষয় হয়ে থাকে নি; জীবনের অতলান্তিক জায়গা জুড়েও তার অবস্থিতি। তা বলে ধ্রুপদী সঙ্গীতের বেলায় কথাটি প্রযোজ্য নয়। কেননা ধ্রুপদী সঙ্গীত জনবিচ্ছিন্ন, লোকসঙ্গীত জীবননিষ্ঠ, ঠিক এ জন্যেই নান্দনিকতার চেয়ে লোকায়ত জীবনের আর্থসামাজিক দিকগুলো লোকসঙ্গীতের বিষয়-আশয় হয়ে উঠেছে। লোকসঙ্গীত সৃষ্টির পেছনে ধানভানা, নৌকা চালনা, শিকার করা, ফসল কাটা, ছাঁদ পেটানো এমনই অসংখ্য অর্থনৈতিক দিক থাকলেও, প্রফুল্লরঞ্জনের শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষার গানে অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও, জীবনের আরও যেসব দিক উপস্থাপিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে।

বাংলার লোকসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত যে ছয়/সাত শত প্রকৃতির গান আছে, প্রফুল্লরঞ্জনের আঞ্চলিক ভাষার গান তার যে কোন এক প্রকৃতির পর্যায়ভুক্ত হলেও, তাঁর গানে জীবন ও সমাজের যে উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে তার দৃশ্যপট কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেই মানুষের জীবনের পাতা উল্টে দেখতে হবে তাঁদের জীবনের আশা-নৈরাশ্যের উপাখ্যান ও তাঁদের অশ্রুত শব্দের পদাবলী। কেননা এই পদাবলীর মর্মবাণীতে যে সুর লুকিয়ে আছে, তা একই সঙ্গে চিরদৈন্যের এবং সূক্ষ্ম প্রতিবাদেরও। আর সেই জন্যেই এই গানগুলো হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজ গবেষণার চিরায়ত উপাদান।

### ৬.১ ভাতের থাল খান দিলি দ্যাখদিন কি হেলা ছেদ্দায়

গ্রামীণ পটভূমিকায় অঙ্কিত বউয়ের ভাত পরিবেশন দৃশ্যের ভাষিক উপস্থাপনে প্রফুল্লরঞ্জন বেশ কুশলী। এই গানে স্বামীর মুখ দিয়ে স্ত্রীর ভাত পরিবেশনের ছবিটা শুধু অঙ্কিত হয়নি, তার শঙ্কিত চিত্তের অবস্থাটার সঙ্গে 'পতি দেবতা' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গটিও বর্ণিত হয়েছে—

ভাতের থাল খান দিলি দ্যাখদিন কি হেলা ছেদ্দায়
কতকটা মাটিতে প'লো কতক প'লো আমার গায়।
ভাত দিলি তার জল তো দিলি নে
তোরে যে কি অরবো তাতো দিশে পাচ্ছিনে
দর পচিশন ঠিক রাখলিনে
মরে গেলাম তোর জ্বালায়।
হইগে আমি নোক ছাতামাতা
তোর কাছে তো তেমু আমি পতি দেবতা
আমার মনে দিলি ব্যথা
ঠেকপি পরকালের দায়।
অ্যাহোন যদি বেশী কিছু কই
পাড়ার নোকে আসে অ্যাট্টা করবেনে হৈ চৈ
মানের ভয়তে চুপ করে রই
নাই পা'য়ে পাও দিস মাথায়।

প্রফুল্ল কয় কলি কালে' কল,
কথায় আছে কালে হবে মেয়ে লোক প্রবল,
রাগ করে আর হবে কি ফল
খাও যে সময় যা মাপায়।

স্বামীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে স্ত্রীরও উত্তর—

ব্যস্ত সোমায় যা পাইছো তাই চোখ কান বুজে খাও
থাবা খানেক ভাত পড়িছে মাটির তে কুড়োয়ে নাও।
জলতো তোমার না অলিও অয়
কাছাতে হাত ঘসা দিয়ে খাওতো সব সোমায়
ভদ্দোর নোক হও সোমায় সোমায়
তাইতি অতো ব্যথা পাও।
ভক্তি তুমি থোবা কোন জাগায়
পাত্তরে যা ধরে তারতে বেশী খেডা পায় (?)
জোর করে যে খানিকটে চায়
সে পাবে না এক তোলাও।
আগে' নইছে ছোট বাচ্চাডা
তারির মধ্যি তোমার আবার দারুন তাগাদা
কমডা তাল করি সোমাধা (?)
দুইহেন হাত আর দুইহেন পাও।

**৬.২ বউয়ের মুখ আন্ধারি যুত**

প্রত্যেক মানুষের একটা প্রাপ্তিযোগ আছে। বউ স্বামীর কাছে যা পেতে চায় তা পায় না বলে মুখ অন্ধকার করে সারা দিন কাজ করে। স্বামী তাকে নিয়ে এত রঙ্গ-তামাশা করে তবুও স্ত্রীর মুখে হাসি দেখতে পায় না। সে ভালো করে বোঝেও না তার বউয়ের মর্মযাতনা। যখন কিছুতেই তার মন পাচ্ছে না তখন বউকে ছেড়ে দিয়ে ভেকের আশ্রয় করে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়াই স্থির করে বলে—

মুখ আন্ধারি যুত খানি তোর যায় না কি কারণ ?
এতো ভালোফাসে হাসে রসে তেমুতো তোর পাইনে মন।
কালোট মারে থাহিস অম্বালায়
ও দেহে আর খাটা খাটনি করি কোন আশায়
ধার অইছে কোন জাগাডায়
কদিন শুনি বিবরণ।
কিসিতি তোর বাধিছে গোলমাল
তিলডে পালি অকারণে করে বসিস তাল,
সোংসার ডা তুই করলি পয়মাল
করে নানান জ্বালাতন।
আমার পেম অজেন্য যদি অয়
পাশ পোট কাটে দেলাম তোরে যা য্যানে মন নয়
করে আমি ভ্যাকের আশ্রয়
চলে যাই ছিরি বৃন্দাবন।

নানা রকম কষ্টের কথা স্বামী বললেও, তার ভালোবাসায় খালি ফাসা, মনের ফাঁক বোঝে না বলে বউয়ের কষ্ট। বউয়ের আশা তারা প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। ঘুরে বেড়াবে যত্রতত্র। তা যখন হলো না, উল্টে স্বামী তার কাজের ভুল ধরে এবং বেঁধে রাখতে চায় সংসারের কাজের বাঁধনে, তখন কালোট মেরে মুখ অন্ধকার করে থাকা ছাড়া তার আর উপায় কি ?

মুখ আন্ধারি যুত আমার এজম্বে যাবে না।
তোমার ভালো ফাসায় খালি ফাসা
মনের ফাঁক তো বোজে না।
তোমার সাথে চ'লে জীবনে
সলোকের মুখ দেখলাম না এ দু'টো নয়নে
কালোট মারি সেই কারণে
বুঝে তো তা দেখলে না।
বড় আশায় ছেলো অন্তরে
ঝাপ দিয়ে পড়বো দুইজন পেমের সাগরে
বান্ধে রাখলে ডাঙ্গার পরে
জলে নামতি দিলে না।
তুমি ধরলে আমার কাজের ভুল
আমি খোচলাম জনমভরে না পাই গাছের মূল
তোমার পদে দেলাম যে ফুল
সোহাগ ভরে নিলে না।

এই মুখ আন্ধারি যুত সম্পর্কে অন্য একটি গানে গভীর গোপন মর্মবেদনার সুর শোনা যায়। সেখানে মনাগুনে পুড়ে খাক হয়ে মনের যে ব্যবধান তৈরি হচ্ছে তা স্বামীকে বোঝাতে চায় না স্ত্রী—

যা আছে তা মনের মধ্যি থাক
মনাগুনে পুড়ে পুড়ে হয়ে যাবো খাক
বুজতিছে না মনের ফারাক
এর বেশি ফাঁস করবো না।
আমার এই যে মুখ আন্ধারি যুত
না ক'লি যে বুঝতি পারে সেই পুতন্তীর পুত
বলুক মন্দ ধরুকগে খুঁত
কোন তাতে ভোলবো না।

**৬.৩ পুজো-দ্বন্দ্ব**

দুর্গা পূজা বাঙালি হিন্দুর একটি শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ সামিল হয়। এই সময় মেয়ে-জামাই এনে নতুন জামা-কাপড় দেয়ার রেওয়াজ থাকলেও, সবার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। আর সংসারে টানাটানি থাকলে তো কথাই নেই। এ রকম দুর্দশার বছরে লোকজন যেখানে খেয়ে না খেয়ে দিন যাপন করছে, তাছাড়া, ঘরে যখন এক কুলো ধানও বাড়ন্ত, সে অবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে মেয়ে-জামাই আনার কথা বলায়, রাগে ক্ষোভে যে বয়ান দিয়েছে তা উদ্ধৃত করা গেলো—

গলায় দড়ি নয়ে ছ্যানাল মারিস নে তুই ক্যান ?
গালিতি নজ্জা হয় না মারিতি নাই অপমান।
বোছোরের দুদ্দশা ঠিক পা'য়ে
দিনো পাত করতিছে নোকে খা'য়ে না খা'য়ে
কেমন করে আনবো মা'য়ে
ঘরে নাই এক কুলো ধান।
দিক গুটিক টাহা বা'র ক'রে
মা'য়ে জামাইর চোদ্দপুরুষ আনিগে ধরে
খা খা ঘরে কেমন করে

ধরিস মা'য়ে আনা গান।
আমার ঘাড়ে জোঙ্গাল চাপায়ে
ঘানির 'পরে শুয়ে নিচ্ছিস ত্যালটুক গালায়ে
এদিগি যে ঘুরলি খায়ে
বারোয়ে যায় আমার জান।

স্বামীর এত কথা শোনার পর রাগান্বিত স্ত্রী লক্ষপতির ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের প্রসঙ্গটি জানিয়ে দিতে কসুর করেনি। আর নারী নির্যাতনের অমোঘ নিয়তির কথা জানিয়ে সে বলেছে—

টানাটানি ছাড়াই ক্যামবালায়
সোয়াসেরী বাড়ি তুমি মারবা এক সোমায়
ফ্যান পড়ে না আমার পাতায়
জানে পাড়া পশীগণ।
মা'য়ে আনবা এক বোছর পরে,
তাতেও তোমার টাকোর ট্যাকোর করে অন্তরে
বাছা খাচ্ছে পরের ঘরে
শাউড়ী নোন্দের নির্যাতন।

### ৬.৪ চুরি ছাপান আলতা সিঁদুর রাকফেন মা সবাই

বাজারের চানাচুর ভাজাকে লোভনীয় করে তুলতে প্রফুল্লরঞ্জন গান বেঁধেছেন। আবার ফেরিওয়ালার মাল ফেরি করার জন্যেও গান লিখেছেন। পার্থক্য চানাচুরকে আরও লোভনীয় করে তুলতে যেমন তাঁর জুড়ি নেই, তেমনি ফেরিওয়ালার নানা পদের মালের মধ্যে চুড়ি, সাবান, চিরুনি, আলতা ও সিঁদুর বিক্রির গানেও তাঁর চেষ্টার কমতি নেই। তবে এই মাল সামগ্রীর সত্যিকার গুণাগুণ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেয়ার উদ্দেশ্যে, নাকি রসিকতার ছলে মাল বিক্রির চেষ্টা হয়েছে তা আমরা জানতে চেষ্টা করবো না, শুধু গানটি শুনবো—

চুরি ছাপান আলতা সিদুর রাকফেন মা সবাই-
আরো আছে লটখানা মাল দেখেন তো ঝাহা নামাই।
চিরনি আর এই দ্যাহেন চুরি
গালা দিয়ে তৈরী দেখতি কি বাহাদুরী
তাত নাগলি সব ঢাক গুরগুরি
এক সেকেণ্ডে পুড়ে ছাই।
ছাপান আমার খাটি ছামার বাপ
ঘসতি ঘসতি ছেড়বে কাপড় হবে না তেউ ছাপ
নছিব যাগে ন্যাহাত খারাপ
তারাই কেনবে এ বালাই।
আলতাডার নাম যৈবনের সংহার
জোহের রক্তের সাথে নাইটিক এছিডির মিকচার
যেহানে নবা দেখবা সেহানার
চৌদ্দ পাল্লা খাল্লা নাই।
সিন্দরী এক তামোশা আছে,
যে নবে সে রোজ ফার খাবে সোয়ামীর কাছে
প্রফুল্ল কয় তোমার আছে
অদেষ্টে ছিলুমীর ঘাই।

### ৬.৫ স্বামীর ক্ষোভ

উর্পযুক্ত গানগুলোতে ভাত পরিবেশন, স্ত্রীর মুখ আন্ধারি যুত, পূজায় মেয়ে-জামাই আনা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এবার অন্য রকম গান, যেখানে স্বামীর আচরণে ক্ষুব্ধ স্ত্রী। আবার স্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ স্বামী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার কৃতকর্মের খতিয়ান পেশ করেছে এই গানটিতে। স্ত্রী ঘর গৃহস্থালীতে যথেষ্ট গোছালো নয়। অনবধানবশত তার হাতে এটা ওটা ভেঙ্গে গেলে স্বামীর রাগের অন্ত থাকে না। তাছাড়া, ধর্মকর্মে অচলাভক্তি না থাকায় ক্ষুব্ধ স্বামী তাকে ছাইকপালী, গাছো পেত্নী সম্বোধন করে তার ক্ষোভ বর্ণনা করেছে।

ছাইকপালী চুলোমুখীরে ও গাছো পেত্নী
কি খ্যানে তুই এ বাস্তে আলি,
আমার সাত পুরুষের বসত ভিটায় রে
তুই ছুচোর ঘাটি বানালি।
বদনা গাড়ু থাল ঘটী-বাটী
শানে পাছাড় খাওয়ায়ে তুই করলি চুরমাটি
আমার পুঁজি পাটী চুনীর খুটীরে
তুই ডালে মূলে খোয়ালী।
সাধু মুখের মধুর আলাপন
কিষ্টো কথা বোষ্টেম কথায় দিলিনে তুই মন
তোরে সাধে কি কয় বংশের ওথোন রে
আমায় মুগুর বান তুই ধরালি।
কপালে তোর বাসি আহার ছাই
নাইয়েরেতে দু'দিন যায়ে দাঁড়াবার যো নাই
তোরে পরান চিরে দেছেলাম ঠাঁইরে
তুই বুকে আগুন জ্বালালি ।

### ৬.৬ বিয়ে দি নেই দেছে ছাই

কৌলীন্য প্রথার কারণে কিংবা দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে টাকা পয়সার প্রয়োজনে অনেক সময় অসমবয়সী অথবা হাবা-গোবা বরের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ হতো। বাবা-মা মেয়ের জৈব দিকটার চেয়ে ভরণ পোষণের দিকটা প্রাধান্য দিতো। কিন্তু বিবাহের পরে মেয়ে কেমন আছে তা তারা খোঁজও নিত না। হাবা-গোবা স্বামীর পাল্লায় পড়ে তার জমে থাকা যত কষ্ট দিদি কে পেয়ে আর ধরে রাখতে পারে না। তাই আর্তনাদ করে বলে—

কষ্টের কথা কবো তোগে কি
ও দিদি আমার তো আর
সবার কায়দা নাই।
টাহা খায়ে বাপ-মা আমার
বিয়ে দি নেই দেছে ছাই।
ওর যে গুণ তা মুহী আসে না
শ্যামের মোনাই ধান ভানা সয় কিছু জানে না
মানুষ বুলে কেউ ছাচে না
ছিমড়ীরে কয় মাগী ভাই।
তিন মাস হলো পরুন কাপড় নাই
ক্যাথা পরে মোশোর পরে নাক নজ্জা ঠ্যাহাই
কলি অরে ধানাই পানাই

আজ আনি কাল আনতি যাই।
খাতি গেলি কবে সব সোমায়
এডা হইছে পাচোন ওডায় সিদ্ধে গন্দ কয়
মানষির শরীল আর কত সয়
মোনে কচ্ছে হাকিম খাই।

অন্য একটি গানে বুড়ো বরের পাল্লায় পড়ে যুবতী মেয়ের কি দশা হয়েছে তার বর্ণনা শুনবো। তখনকার সমাজের অসমবয়সী বিবাহের ছবি ধরা পড়েছে এ গানটিতে।

ওরে বিধেতা বুড়োর হাতে ফেললি আমায় ক্যানরে ?
নড়া দাঁতের পচা গন্ধে গা করে আনছানরে।
খক খকায়ে কাসে বুড়ো হাঁপে ধরলে টানরে
মেহো ধাতির প্রেমের জ্বালায় ভিজায় বিছান খানরে।

**৬.৭ অসুখ প্রসঙ্গ**

অসুখে বিপর্যস্ত মানুষের দুরবস্থা প্রফুল্লরঞ্জনের চোখ এড়িয়ে যায়নি। বাতের ব্যথা, মাজার ব্যথা, অম্বলের ব্যথা, চুলকানি, দাদ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিষয়ে গান লিখেছেন তিনি। লোকজ ভাষায় রচিত এ গান হাসির উদ্রেক করলেও চোখের জল অদৃশ্য নয়। চুলকানি প্রসঙ্গে রচিত দুটো গানের বিষয় একই রকম হলেও একটি গানে পারিবারিক সমস্যার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। প্রফুল্লরঞ্জন চুলকানিকে লোকজ ভাষায় খাজনী বলেছেন। চুলকানির ফলে কি অবস্থা ঘটে তার বর্ণনা—

প্রথম যখন খাজনী লয়, বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি মনে হয়
পরে যে যাতনা হয় ঠিক যমপুরী দেখায়।
পেটে যখন খাজনী লয়, পিঠ রাগেতে চুলকিয়ে যায়
আমি হাত দিয়ে নাহি পেরে ঝিনেই কাড়ইছি শেষটায়।
ছেলে-পেলে সব দিনের বেলায় ভালো মনে খেলে বেড়ায়
রাত হলে শুধু চেচায় খাজনীর জ্বালায়।
কেহ বলে খাজায়ে দাও, কেহ বলে গায় হাত বুলাও
কোলে করে লয়ে বেড়াও বায় না ধরে মেয়েটা।

বাতের ব্যথায় অস্থির বৃদ্ধার কাতরোক্তি প্রকাশিত হয়েছে একটি গানে। ব্যথা-মুক্তির আশায় তেল মালিশ করা ছাড়াও তার রাঙা পায়ে গুল বেঁধেছেন, কিন্তু কিছুতেই ব্যথার উপশম হচ্ছে না। যদিও—

কবিরাজে বলে আমারে
একাদশীর দিনে থেকো উপবাস করে
বল উপোস কাপাস কেবা করে
আমার উপোস করলি প্যাট কামড়ায়।
আমাবস্যে পূর্ণিমে রাতি
অনেক মানসি কইছে আমায় ভাতটা না খাতি
ভাত না খালি নাম্বা রাতি
আমি বিছেয়ে যাই বিছানায়।

নড়াইলের ম্যালেরিয়া সংবাদপত্রে এক সময়ের আলোচিত বিষয় ছিলো। মশা সম্পর্কে কালিয়াকে নিয়ে একটি ছড়া প্রচলিত আছে—

ডাঙ্গায় মশা জলে জোঁক

কেমনে বাঁচে কা'লের লোক।[১৯]

কালিয়া এক সময় মশা শুন্য হলেও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। তার প্রমাণ প্রফুল্লরঞ্জনের গান। মশার উৎপত্তি সম্পর্কে রসিকতা করে তিনি বলেছেন—

ত্রেতাতে লক্ষ্মণের বুকে মারলো রাবন শ্যাল
সেই শ্যালের তে জন্মিছে এই রক্ত চোষার পাল
খর দুষ্টুতি বাধায় কাউতাল
র‍্যাশ লাগে তার সাধুর গায়।

**৬.৮ জোঁকের ভয়**

উপরে বর্ণিত ছড়ায় মশার সঙ্গে জোঁকের কথাটিও উল্লিখিত হয়েছে। সেই জোঁকের ভয়ে গ্রাম্য মহিলার ভয় কাতুরে অবস্থাটি প্রফুল্লরঞ্জনের গানে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

জোহের ভর জ্বালায় দিদি গেলাম মোটে মরে
আমার ঘটে যেটুক বারুজ ছেলো
ভয়তে গেলো ঝরে।
পানে জোহের জ্বালায় দিদি নামে গলা জলে
আফালিদে চান করা মোর ঘটলো না কপালে
আমি পোলা বাঁচাই তোলা জলে
ইহ জনম ভরে।
চেনে জোহের পিলপিলেনি দেখলি ডাঙ্গার পরে
গ্যাদ গ্যাদায়ে ওঠে গতর ধরে ঘেন্না জ্বরে
পোড়া জনম নিছি চাষার ঘরে
কি যে নি পাপ করে।

**৬.৯ মাছ, মোচা, মিষ্টি ও খেজুর-রস**

এবার খাওয়া প্রসঙ্গ। ভাত-মাছ বাঙালির নিত্য খাবার হলেও, এমন অনেক খাবার আছে যা নিত্য দিনের খাবার সত্ত্বেও বিশেষ অঞ্চলের খাবারের প্রাপ্তি বড় আনন্দের হয়ে ওঠে। সেই বিশেষ বিশেষ খাবারের প্রসঙ্গটি আলাদা গানে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, বুতের বিলের কই মাছ, ময়নাপুরের খেজুরের রস। বুতের বিলের কই মাছের এক বিঘত সাইজের খবর শুনে খাবার লোভে গিন্নির পেট খামচানি জ্বর হয়। আর ময়নাপুরের খেজুর রসে এমন আসক্ত হয়ে পড়ে যে, সেখানে মেয়ে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা করার কথাও মনে হয়। আর তিনটে ইলিশ মাছ ভাজা, ঝোল ও অম্বল করে খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে স্বামী-স্ত্রীকে শুনিয়ে দিলে—

তিনডে ইলসে অ্যায়লা একদিন
খাতি যে জন চায়
সে ব্যক্তি যার বাস্তে যায় তার
বাস্তোদেব ভয়তে পালায়।
সাধু সতী যারা দনিয়ায়
পতিরি খাওয়ায়ে তারা পাতে পেসাদ পায়
সোংসার তারা সুন্দর বানায়
স্বভাব দে অভাব তাড়ায়।
এই রহোম যার তালোচেরা খাই

---

[১৯] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫) সপ্তম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৮), পৃ. ১৪০।

তারে পুষে সোংসারের সুখ কোন ফেলি বাড়াই
ভূত খাটে যা করি কামাই
ফুৎকারে ও সব উড়ায়।
গুণে দিয়ে জ্যান্তো টাহাডুন
গিন্নি বুলে আনলাম ঘরে জাত গিন্নি শগুন
আমি হবো ও হাতে খুন
দুঃখীরাম বৈরেগীর ন্যায়।

গিন্নির তিনটে ইলসে খাওয়ার আশা অপূর্ণ রয়ে গেলেও অন্য একটি গানে ভাজা-পোড়া, খাবার প্রতি আগ্রহী মানুষটির অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। ইলিশ ভাজা, কই মাছ ভাজা, পোনা মাছ ভাজা, তেউলী টাকি ভাজা পছন্দ লোকটার। চিটে গুড়ের সঙ্গে কলাই ভাজা খেতে আগ্রহী লোকটা আলু, কচু, বেগুন, মোচা পোড়া, এমনকি শনিবারে টাকি মাছ পোড়া খেয়ে শনির দৃষ্টি কাটাবার বাসনাও প্রকাশ করেছে। আর ভাজা-পোড়ায় অনাগ্রহী কবি কেবল চিন্তার আগুনে ভাজা হয়েছেন।

ভাজা পোড়া ইলিশ, কই মাছ খাওয়ার পরে সন্দেশ, জিলাপি, রসগোল্লার প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে অন্য একটি গানে। তার পকেটে পয়সা নেই, আর ধারেও যখন মিষ্টি খাওয়া সম্ভব নয়, তখন মিষ্টির বদলে চিটা গুড় খাওয়া ছাড়া উপায় কি। আর পয়সাহীন পকেটে পারমার্থিক মুক্তির জন্য মক্কায় তো যাওয়া হবেই না ; বরং গয়ায়ই যেতে হবে। কেননা সেখানে মৃতের শেষকৃত্য হয়।

আমার মন কেবল ময়রার মিড্ডাই খাইতা চায়।
আমি পাইমু খাইমু কেমন কইরা রে
ওরা খাইতা চাইলা দাম হাকায়।
হাট-বাজারে যহোনে যাই
দেহি হাইরে হাইরে বইছা মিড্ডাই (মন)
আমি ঢোক চিপি আর ছ্যাপ গিলা খাইরে
কও দিন পয়সা করি পাই কোবায়।
গোল্লা গোল্লা আর হাই পেচী
হুনি এডারে কয় জিলাখেচী (মন)
আমি হোন্দেশ খাইয়া নিহাশ গিছিরে
এট্টু ত্যাল ফ্যানাইয়া দাও মাথায়।

### ৬.১০ কন্টোলের খাকসো শাড়ি

এক সময় কন্ট্রোলে কাপড় বিক্রি হতো। সে কাপড়ে স্বস্তি না পেয়ে এক মহিলা আর একজনকে যে কথা বলেছে তাই-ই গানের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই গানে শাড়ি সম্পর্কে যে বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তাতে আমরা একটি সময়কে চিহ্নিত করতে পারি। এসব মিলিয়ে শাড়ির অবস্থাটা একটু দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে—

সিটকেনে পাড় সূতো মোটা
বুন্যি যেনো কেস্বী বটা
ভিজলে পরে আরাক ল্যাটা
দিন সোমরে রস মরে না।

এই শাড়ি সম্পর্কে অনেক কথা বললেও লজ্জাশীলা রমণী আরেকটি কথা লজ্জায় বলতে না চাইলেও আমরা জেনে গেছি—

চলতে গেলে পথের মাঝে
দাপুর দুপুর বাজনা বাজে
আরাক কথা কইনে লাজে

শুইলে মাজায় খোট থাকে না।
আগের কাপড় ছিলো ভালো
চিকন বুন্যি পাড় জমকালো
যৌবন এলো তাও ফুরালো
মলেও মনের বেগ যাবে না।

কন্ট্রোলের খাকসো শাড়ি যাদের কেনার সাধ্য ছিলো তাদেরই শুধু পছন্দ অপছন্দের কথা শোনা যায়। যাদের পছন্দ অপছন্দের চেয়ে প্রাপ্তিই বড় কথা, আর চোরা পথে কাপড় কেনাও সম্ভব নয়, সেই হতদরিদ্র মানুষের কাপড়ের ভাবনার গভীরতা কত তীব্র, তা একটু শুনা যেতে পারে—

অ্যাহোন কাপরের ভাবনায় চাচা মজক ঠাণ্ডা নাই
বাইরে মোগো যেমন তেমন, কও, ঘরে ওনগো কি পরাই।
তিনডে টাহার হইয়া দেনা মুই নিছি একখান ডুমা কিনা
হিনি টানে ছেরা ত্যানা
দেইহা চোহের জল ফেলাই
কন্টোলে এক পাউটো আইছে বহুত নোকে তাই কিনতাছে
কাঙ্গাল গো কি উপায় আছে
বইহা বইহা ভাবছি তাই।
চোরা পডীর বাজার ধইরা কাপড় কিনমু ক্যামন কইরা
দিন খাটা মজুরী কইরা
গাও ঢাকি না প্যাট চালাই।

এক শ্রেণীর মানুষের যখন এই অবস্থা অন্য শ্রেণীরা তখন কলকাতা থেকে মোলায়েম শাড়ি কিনে আনার জন্যে প্রাননাথের কাছে পায়ে থরে মিনতি করছে। খাকসো শাড়ি পরে কি দশা হয়েছে সে কথার পাশাপাশি শাড়ি আনবার উপায়টাও প্রাননাথকে জানিয়ে দিয়েছে। এ কাজে পাপ হলে গঙ্গা জল দুই/এক ঢোক খেলেই তা কেটে যাবে এমন আশ্বাস দিয়েছে।

খাকসো শাড়ি পরে পরে
দাদ হয়েছে গায় গতরে
চুলকানিতে ধরলে পরে
যায়না ব্রজের ভাব থামানো।
ধোলাই করে আনলে নাকি
করে না কেউ দেখাদেখি
দিতে গিয়ে কোরাই ফাঁকি
থলি সুদ্ধ যায় না যেন।
গঙ্গায় গিয়ে স্নানটা করে
জল এক বোতল এনো ভরে
ওর দুই এক ঢোক খেলে পরে
ব্লাক করা পাপ যায় খেদানো।

'ব্লাক করা পাপ খেদানো'র চেয়ে লাভজনক বলে অনেক শাড়ি আনার একটা উপায়ও বাৎলে দিয়েছেন প্রফুল্লরঞ্জন।

অ্যাটে পিঠি আটখান বান্ধে
চারখেন আনবো দাপনায় ছান্দে
এক সাথে এক জোড়া পেন্ধে
সাজে আসব খোদার খাশী।
তুমি যদি যেবায় সেবায়
আনতি পারো জোড়া পাঁচ-ছয়

দুনের বাতাস লাগবেনা গায়
টাকা ধরবো রাশি রাশি।

চোরা কারবারিতে লাভ হলেও, ঘরের লক্ষ্মী বেজার। কেননা পুজোর সময় একটা ভালো শাড়ি চেয়েছিলো বউ, যা পরে সে পুজো দেখে বেড়াবে। কিন্তু স্বামী এমন শাড়ি কিনে দিয়েছে যার—

সিটকেনে পাড় বুন্যি বেখাস্তা
বৈরেগীরা বানায় এদে চাল থোয়া বাস্তা
এই হেন বুঝি পা'য়ে সস্তা
ভালোফাসে আনিলে। ...
বোঝলাম তোমায় এই কাপড় কেনায়
মাছের কাঁটার মত তোমার বাধিছে গলায়
আজ ভালোফাসার গাছের গোড়ায়
কুরোলের কোপ মারিলে।

যে লোকের জমি জিরেত করে জীবন চলে যায়, তার ভালো কাপড় কেনার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। তাছাড়া, বছর ভরে কিনে খাওয়া। এ অবস্থায় সংসারের নানা রকম সমস্যা কাটিয়ে ভালো শাড়ি কেনা সম্ভব হয় না। তাই বউকে জানিয়ে দিয়েছে কাপড় কেনায় ভালোবাসা প্রকাশ পায় না। ভালোবাসা অন্তরের জিনিস তাকে কেনার মধ্যে আনা কেন।

এ পূজোতে ভাল কাপড় দেব ক্যামবালায়
বোছোর ভরে কিনে খাওয়া
তাল সামলানো বিষম দায় ।
নগদ কড়ি কিছু নাই হাতে
বিল কুড়োয়ে দিছি এবার দায়িক দেনাতে
কি যেন কি হয় বরাতে ভূঁইটুক যদি স'রে যায়।
তুই ধরিছিস কাপড়ের বয়ান
গাছের বাকল পরে সীতা সাবিত্রী পায় মান
পতির পরে যার আছে টান
সেকি ভাল কাপড় চায় ?
ভালোফাসা অন্তরের জিনিস
কাপড় কেনার মধ্যি তারে ক্যান টানে আনিস,
তোর ভালো তো তুই বুঝিস,
আমার ক'দিন কি উপায় ?

### ৬.১১ বিনোদন

খাওয়া পরার পরেই আসে বিনোদন। পুরুষের যেখানে সেখানে আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে গতায়াত থাকলেও মেয়েদের সে স্বাধীনতা নেই। তারা 'এইটে ভালো, ওইটে মন্দ যে যা বলে সবার কথা মেনে/নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে ' সংসারের সব কাজ করে ।এমনকি জানার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত তারা। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১)কবিতায় তাইতো শুনতে পাই :

জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,[২০]

---

[২০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুক্তি', *সঞ্চয়িতা* (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৫), পৃ. ৩৯০-৩৯১।

রাঁধা কাজে বন্দী রমণীরা অপরের কাছে গল্প শুনে স্বামীর কাছে সিনেমা দেখার আবদার করে বলছে—

ছিনেমা দ্যাহাতি একদিন নিয়ে গেলে না।
বস্য কালে মনের আউস বুঝেও তুমি বুঝলেনা।
শুনিছি সে ছবির যোগ্যতা
চোখ ঘুরোয়ে হাত নাচায়ে কয় পেমের কথা
রইলো মনে মনের ব্যথ্যা
এমন তা দ্যাহালে না।
খালি তুমি যাবো যাবো কও
যাতি কলি সোমাক কালে গম্বুজ মারে রও
দেহে আসি এই কি তে নও
নাম্বা দিন আর ফেলে না।
ওপাড়ার ঐ রাঙ্গা দিদিরে
টকির খেলা দেহে আইছে দশ বারো ফিরে
দিচ্ছি তোমায় মাথার কিরে
এ মিন্নতি ঠেলে না।

বউয়ের মিনতি মাখা আব্দারের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী তার অর্থনৈতিক অক্ষমতার কথা জানিয়ে বলেছে যে, তার ভাগ্য এতই খারাপ যে, তার প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল পায় না এরকম প্রতিকূল অবস্থায় সে নিজেই টকি হয়ে গেছে। তার বয়ান—

নেবো তোরে নেবো এইদিন টকি দ্যাহাতি
বাতিকটেরে থামায়ে রাখ ফসল নওয়া তামাতি।
যাতি চায়ে যাইনে আমি ক্যান
সে বিত্তেন্তো বুঝতি গেলি অনেক নাগে জ্ঞান
যেডা ধরি তাইতি রোকসান
পারিনে ভাইল ধরাতি।
কষ্টের কথা কব কোন জাগায়
নিজি গিছি টকি অয়ে অভাবের জালায়
তাতে নানা খানা গুজব কথায়
পারিনে ভয় থামাতি।
ওগের সাথে মোগের চলে না
রোজ ওরা ছিনেমা দেখলি কে করে মানা,
ওকতে আনা ওকতে খানা
এই আমাগে ব্যাসাতি।

অর্থভাবে সিনেমা দেখা না হলেও, বারোনির স্নানে যাওয়া নিশ্চয়ই বাধাগ্রস্ত হবে না। এরকম মনোভাব থেকে গিন্নি কর্তাকে বিষয়টি অবহিত করলে,স্বামীর বারুণীর মেলায় মেয়েদের হরেক রকম অসুবিধের পাশাপাশি 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' কথাটি বলে স্ত্রীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছে। তার বক্তব্য—

মায়ে মানষির বারোনিতি যায়ে দরকার নাই।
সেহানে ঠেলাঠেলি গুতোগুতি হ্যালাই কাণ্ড যাচ্ছে তাই।
দুরন্ত ভীড় হবে সেই জাগায়
খেডা যে কার ঘাড়ে পড়ে বুঝে ওঠা দায়,
কার বোকচা যে কে কাড়ে' নেয়
সগোল জাগায় হাত সাফাই।

ওর মধ্যি তোর যাওয়া উচিত নয়,
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নোকে বেদে কয়,
নিয়ে যাবো রথের সোমায়
এবার যদি সুযোগ পাই।
আলুয়াবিন্দি ঘর গিরেস্তালী—
ম্যাজিক খেলা হয়ে যাবে দুই জনে গেলি:
খায়ে ফেলবে গাছ গাছালী
আসে ওগে ছুচো গাই।
প্রফুল্ল কয় বোছোর ভালো নয়
এবার এট্টু বুঝে চলা বুদ্ধির পরিচয়
বুঝে দ্যাহো কি ভালো হয়
আমি বলি থামাও বাই।

কর্তার কথায় ক্ষুব্ধ গিন্নি কথায় দৃঢ়তা এনে বলেছে যে, যদি বারুণীতে না যেতে পারে তাহলে ছিলিন্দেমারিতে তার মাসির কাছে চলে যাবে। কেননা কর্তার মান টানা কথা গিন্নির অপছন্দ। এ বিষয়ে তার উত্তর—

ভালো কাজে যাতি চালি নিষুদ কর ক্যান
তুমি যাবা সগল জাগায় আমি গেলি কি লোকসান (?)
দ্যাশে আইছে জাত বাড়ী আইন,
স'রে গেছে দাবড়ি দিয়ে বোকচা কাড়া দিন,
ত্যোহোন মায়ে-পুরুষ সমান স্বাধীন
কুকুর খাবে মুগুর বান।
অনে যদি না যাতি না যাতি পারি,
মাসীর বাড়ী যাবো চ'লে ছিলিন্দেমারি
সগোল কাজে আন্তাবাড়ী
সগোল সোমায় টানবা মান।
দুই চোখ বুজলে দুনে অন্ধকার,
দিনের দুচ্চার আমার আমার বিচি গোনা সার
কারবা বাড়ী কারবা সোংসার
সাথের সাথী ধর্ম্ম জ্ঞান।
প্রফুল্ল কয় বিষুম সমস্যা
এরপরে আর কথা কতি পাইনে ভরসা
এ্যাহোন করলি ত্যালা ঘষা
বাধবেনে এক গেরে ছ্যান।

**৬.১২ থানা-পুলিশ**

গ্রাম্য সামাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মারামারি হয় না এমন নয়। সময় মতো ভাত দিতে না পারায় স্বামী স্ত্রীকে যে ভাবে মেরেছে তার বয়ান আমরা স্ত্রীর মুখ থেকে শুনবো—

খালি খালি নিব্বুংশে আজ মারিছে আমায়।
খুরো ভাঙ্গা পিড়ে ধরে বাড়ি দেছে তাল মাথায়।
কনে যেন যাবে তাই জানে
তস্যে তস্যে রাঁধতি গিছি চাল চা'য়ে আনে
সোমর পাড়ে' বিল তাতানে
নয় নামাতি পাতড়া চায়।

স্বামী-স্ত্রীর এই মারামারি শেষ পর্যন্ত থানায় নালিশ করা পর্যন্ত গেছে। অসহায় স্ত্রী বলছে—

যাচ্ছি দেহি দারোগার কাছে
খালি খালি মারবে এমন কি আইন আছে,
দধি ওনার আছে পাছে
পাবেনে আজ সেই জাগায়।

স্বামী এ কথার যে জবাব দিয়েছে, তা পুলিশী ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের যে অন্তরঙ্গতা থাকে, তার ইঙ্গিতবহ হলেও কথাটি একটি প্রবচনে রূপ নিয়েছে।

থানায় যায়ে করবি আমার কি ?
বড়বাবুর সাথে আমার দারুন ইয়ারকি
নালিশ করে করবিনি কি ?
ঘাই খাবিনি স্যাও জাগায়।

স্বামী-স্ত্রীর ঘরোয়া বিবাদ নিয়ে থানা-পুলিশ করাটা বাংলাদেশের একটি প্রচলিত বিষয়, কিন্তু স্ত্রীর কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী যে উত্তর দিয়েছে তার মধ্যেই নিহিত আছে সমাজের চিরকালের ছবি।সামাজের শক্তিশালীদের সঙ্গে স্থানীয় শক্তি অর্থাৎ থানার পুলিশ-দারোগার যোগসাজস সেকেলে প্রসঙ্গ নয়, আজকের দিনে ও সমানভাবে প্রযোজ্য।

## ৭. উপসংহার

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস মাটি-মানুষের কবি। লোকসঙ্গীতের ধারায় তিনি বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা। আমরা খণ্ডিত করে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষার গানের ওপর আলোকপাত করলেও, অসংখ্য গানকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আড়াল করতে হয়েছে। ফলে এখানেও প্রফুল্লরঞ্জন সম্পূর্ণত উপস্থাপিত হতে পারেননি। যদিও আঞ্চলিক ভাষার গানের পটভূমি ও বিষয়বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি গ্রাম্য মানুষের আটপৌরে জীবনের যে বিষয়-আশয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তা বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে অশ্রুতপূর্ব। আমরা বিশ্বাস করি, জন্মশতবর্ষে উপেক্ষিত এ কবির গানের সম্ভার প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে যোগ হবে নতুন মাত্রা। এবং আমরাও পাবো নতুন একজন লোককবি, প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসকে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩

# চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভূতভাগানো গান : পরিচয় ও প্রকৃতি

আবুল হাসান চৌধুরী *

**Abstract:** An extraordinary form of folksong named *Bhut-Bhagano Gan* available in the rural community of Chapai Nawabganj in Bangladesh . People of the area believe that, the practice of evil spirit *bhut* is harmful to human being, especially to women. Exorciser named by *ojha* use these songs to drive away the evil spirit. In this article an attempt has been taken to reveal the characteristicts of the songs, as well as the related folk beliefs and folk rituals.

## ভূমিকা

পঞ্চভূত[১] নিয়ে তেমন অবিশ্বাস, সন্দেহ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ত্রস্ততা না থাকলেও পৃথিবীব্যাপী প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই ভূত নিয়ে রয়েছে অদ্ভুত সব বিশ্বাস,ভয়-ভীতি, পূজা-অর্চনা, আচার ও অভিচার। বিজ্ঞজনের মতে, ভূতের ধারণা হলো পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত একটি সর্বজনীন ধারণা।[২] এটি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তোয়াক্কা করে না। আবার, ভূত বা প্রেত বিষয়ক প্রতীতি হলো সহজাত একটি আদিম সংস্কার।[৩] আদিম চিন্তাধারায় ভূত হলো মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্মা বা ছায়াশরীর। সে অদৃশ্য আত্মা অবহেলিত হলে অনিষ্টকারী হয় এবং যখন তখন অশুভরূপ ধারণ করে প্রেতাত্মায় পরিণতি লাভ করতে পারে।[৪] এটি জীবিত মানুষের উপর ভর করে তাকে বিকারগ্রস্ত ও অসুস্থ করে তোলে। এ বিশ্বাস আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর মানবসমাজেও প্রচলিত। আজও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ভূতগ্রস্ত। সারা বিশ্বে ভূত বিষয়ক গল্পকথারও শেষ নেই। ভূত আছে বাংলাদেশেও এবং ভূতে-ধরা বা জিনে-ধরা রোগীরও অভাব নেই; প্রতিটি জেলার সব গ্রাম-গঞ্জেই আছে ভূতের আছর-উপদ্রব। আর তা থেকে রেহাই পাবার জন্যে ওঝা-কবিরাজের ঝাড়-ফুঁক, তাগা-তাবিজ, মন্ত্রতন্ত্র কিংবা বাণ-উচাটনের দেখা মিলবে সর্বত্রই। কিন্তু গান কি মিলবে? অবশ্য এটি ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা-সাপেক্ষ ব্যাপার।[৫] এ জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে এজন্যে যে, 'ভূতের গাহনা' বা 'ভূত ভাগানো' গান বলে

---

* ড. আবুল হাসান চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] *সংসদ বাংলা অভিধান*, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০২) "ভূত" ভুক্তির নীচে।

[২] রেবতীমোহন সরকার, 'ভূত ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান' –সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা* "ভূত ও লোকসংস্কৃতি" বিশেষ সংখ্যা, (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০৪), পৃ. ৪৬৭।

[৩] পল্লব সেনগুপ্ত, "প্রেত ও প্রতীতি: সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, "ভূত ও লোকসংস্কৃতি" বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৫৬৩।

[৪] রেবতীমোহন সরকার,"ভূত ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭-৪৭০।

[৫] উল্লেখ্য যে, মন্ত্র সারাদেশেই কম বেশি আছে কিন্তু ভূতের গান সচরাচর গাইতে দেখা যায় না। ভূত দাবড়ানো /ভাগানো উৎসব হয় এমন দুএকটি এলাকায় গিয়েও দেখা গেছে সেখানে এতৎসংক্রান্ত গান নেই।

যে এক শ্রেণীর লোকসংগীত আছে সে সম্পর্কে আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতিবিদগণ তেমন কোনো খোঁজখবর নেননি। লোকসংগীতের সংকলন ও গবেষণা গ্রন্থগুলোতেও ভূতের গানের স্থান নেই।[৬] বর্তমান প্রবন্ধকার সম্প্রতি চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার কয়েকটি এলাকায় ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ভূতেধরা এবং সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসক–কয়েকজন ওঝা-কবিরাজের কাছ থেকে ভূতের *গাহনা* নামে বেশকিছু লোকসংগীত সংগ্রহ করেছে। এ গান গেয়ে তারা জিনে-ধরা কিংবা ভূতেপাওয়া রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন। এ বিশেষ প্রকরণের গান এবং তৎসম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিবরণ ও বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট।

**ওঝা এবং তাদের ভূতভাষ্য**

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার বারোঘরিয়া, মহারাজপুর; গোমস্তাপুরের চানপুর, গোদাগাড়ীর কাঁকনহাট; নাচোলের পণ্ডিতপুর, আন্ধারাইল এবং পূর্ব মির্জাপুর আলোচ্য 'ভূতের গাহনার' সমীক্ষিত অঞ্চল। এতদঞ্চলে জিন-ভূতেধরা রোগীর যে-কজন[৭] চিকিৎসকের সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁরা হলেন নিম্নবর্গের মানুষ। তবে সমাজে তাদের শ্রেণীগত ঠাঁইয়ে ফারাক আছে। তাঁরা শুধুই কবিরাজ বা ওঝা নন; কারো কারো সামান্য কৃষিজমি আছে—নিজেরাই আবাদ করেন। কেউ কেউ নিতান্তই দিনমজুর। কেউবা আবার রেডিও-টিভির মেকার অথবা টিউবওয়েলের মিস্ত্রি। তাঁদের কোনটা যে আসল পেশা আর কোনটা উপজীবিকা তা ঠাহর করা মুশকিল। বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে যেসব তাবিজ-কবজ ও গাছান্ত ওষুধ দেন তার দাম নেন তাঁরা। তবে ভূতে-ধরা রোগীর চিকিৎসার জন্যে যখন তাঁদের ডাক পড়ে তখন নির্দিষ্ট কোনো ভিজিট বা ডিমান্ড থাকে না। যে যা খুশি হয়ে দেয়, তা-ই গ্রহণ করেন। কবিরাজি পেশায় তাঁরা প্রধানত এসেছেন উত্তরাধিকারসূত্রে। দুএকজন অবশ্য কোনো ওস্তাদের সাগরেদি করতে করতেই শিখে নিয়ে কাজে নেমেছেন। যাহোক,জিন-ভূত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ও বিশ্বাস-সংস্কারও ঐতিহ্যিকসূত্রে প্রাপ্ত এবং পরিবেশ-পরিস্থিতিসঞ্জাত। তাঁদের সবার ভূতভাষ্যও প্রায় অভিন্ন। অর্থাৎ ভূত বলতে কী বোঝায়, ভূতেধরা রোগীর ভাব-লক্ষণ, চিকিৎসার উপকরণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা এবং অনুশীলনে তেমন কোনো তারতম্য নেই। মহারাজপুরের কবিরাজ মঞ্জুর আলী মণ্ডলের মতে, ভূত হলো,'হাওয়া-বাতাস, জিনের ব্যাপার।' এ হাওয়া-বাতাস যার গায়ে লাগবে তার চোখের পাতা ট্যারা এবং মণি হলুদ হয়ে থাকবে। আর গলার রগ দেখলে বোঝা যাবে। নাচোল থানার আন্ধারাইল গ্রামের জামিনুর রহমান এবং তার শিষ্য খোকনের ভাষ্যও হলো: 'হাওয়া-বাতাস' মানেই জিন-ভূত।' নিজেরা চোখে দেখেননি,তবে বিশ্বাস

---

[৬] কলকাতার লোকসংস্কৃতি পরিষদ তাদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*'-র 'ভূত ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা',২০০৪-এও ভূতের গাহনা বিষয়ে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করেননি। আবার, বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী (সম্পাদিত) *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* (কলকাতা:অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স,১৯৯৫) এবং দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত) *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর,২০০৪) গ্রন্থ দুটিতে ভূতের গাহনা সম্পর্কে কোনো অলোকপাত করা হয়নি।

[৭] চাঁপাই নবাবগঞ্জের যে-সকল ওঝার কাছ থেকে ভূতের গান এবং সে সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে তাঁরা হলেন: (ক) আমির কবিরাজ (বয়স ৩৫, শিক্ষা ৫ম শ্রেণী) , গ্রাম: টিকরা, মহারাজপুর। (খ) মঞ্জুর আলী মণ্ডল (বয়স ৬৫, নিরক্ষর), গ্রাম: সালিম ডোল পাড়া, মহারাজপুর। (গ) শ্রী উপেন্দ্রনাথ সিং (বয়স ৭৫, নাম স্বাক্ষর করতে পারেন ) গ্রাম: পণ্ডিতপুর, নাচোল। (ঘ) শ্রী জিতেন্দ্রনাথ সিং (বয়স ৪০,শিক্ষা ৭ম শ্রেণী), গ্রাম: পণ্ডিতপুর, নাচোল। (ঙ) মোঃ জামিনুর রহমান (বয়স ৩০, শিক্ষা ৫ম শ্রেণী ) গ্রাম: আন্ধারাইল, নাচোল। (চ) মোঃ আব্দুস সালাম (বয়স ৫৫,শিক্ষা ৫ম শ্রেণী), গ্রাম: চানপুর হাইস্কার পাড়া, গোমস্তাপুর। (ছ) মোঃ সেকান্দার আলী (বয়স ৩৮, নিরক্ষর ), গ্রাম: কাকন হাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। (জ) মোঃ আফসার আলী (বয়স ৪০, নাম স্বাক্ষর করতে পারেন) গ্রাম: পূর্ব মির্জাপুর, নাচোল।

করেন। মির্জাপুরের আফসার ওঝা মনে করেন, 'ভূত বল্যা কিছু নাই। আল্লার কোরান যারা মেনেছে তারাই জিন আর যারা কোরান মানে নাই তারাই ভূত।' মানুষের জাতের মতো ভূতেরও জাত আছে। যেমন—পেত্নী, কালী , মাশনা, যোগিনী, মাদার (মাদার পীর)। অন্যদিকে জামিনুরের শিষ্য খোকন মনে করেন,'জিনের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান আছে। হিন্দু জিন গান শুনতে চায়। পছন্দ করে-ধূপ, কলা, ফুল ও লাল গামছা। আর মুসলমান জিন শুনতে চায় ইসলামি গজল এবং পছন্দ করে আতর, আগরবাতি-এসব।' রোগীর গায়ে মুসলমান জিন ভর করলে পাক-পবিত্র হয়ে বসতে হয়—এরা গান-বাজনা পছন্দ করে না বলে জানালেন আফসার কবিরাজ। মানুষের সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্ম ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রভাব জিন-ভূতের জগৎকেও স্পর্শ করেছে এখানে। 'ভূতের জাত-পাত কী করে বোঝা যায় ? জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'রোগীরাই বলে দিবে।' রোগীর আচার-আচরণ থেকেও বোঝা যাবে কোন ধরনের জিন তাকে ধরেছে। অদৃশ্য জিন-ভূত যখন কোনো নারী কিংবা পুরুষের উপর ভর করে তখন তারা অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে যেমন—হাসা, কাঁদা, দৌড়াদৌড়ি করা, নাচা , গাছে ওঠা, পানিতে গা ডুবিয়ে বসে থাকা, খাওয়া-দাওয়া বাদ দেওয়া ইত্যাদি। এখানে পণ্ডিত-গবেষকগণের ভূতভাবনাকে যোগ করে দেখা যেতে পারে। তাঁদের কারো কারো ব্যাখ্যানুসারে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যুর পর শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া আত্মাই ভূত বা প্রেতাত্মা। এই আত্মা পরে পুনর্জন্ম লাভ করে অথবা ক্ষেপে গেলে, অতৃপ্ত থাকলে বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অন্য কারো শরীরে ভর করতে পারে।[৮] আর যখনই কোনো জিন-ভূত কারো শরীরে ভর করে তখনই সে অস্বাভবিক আচরণ করতে থাকে। আফসার ওঝার মতে 'ডাকিনী ভূতে' ধরলে সবচেয়ে বেশি খেলে। মেয়ে রোগী হলে আরো বেশি খেলে। পুরুষ রোগীরাও একই আচরণ করে। তখন সে রোগীর হাত-পা কাঁপতে থাকবে, মাথা ঝাঁকাবে। এমন কি রোগী অনেক সময় ওঝার উপরেও চড়াও হয়। এ ভূতাতঙ্ক এবং ভূত সমস্যা শুধু বাংলাদেশেই নয়, সব কালে পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়।[৯] ভূতগ্রস্তরা এহেন আচরণ করতে থাকলে তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও আতঙ্কিত হন এবং ওঝা-কবিরাজের শরণাপন্ন হন।

### ভূতেধরা রোগীর চিকিৎসা ও ভূতের গাহনা

সমীক্ষিত অঞ্চলের ওঝা-কবিরাজদের কাছ থেকে জানা গেছে আশ্বিন-কার্তিক মাসে ভূতে পাওয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আবার চৈত্র মাসে যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে তখনও রোগের সৃষ্টি হয়। মহারাজপুরের আমির কবিরাজের কাছ থেকে জানা গেল, হিস্টিরিয়া বা এক্লামসিয়ার রোগীকেও ভূতে ধরেছে বলে মনে করে ওঝা ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্জুর আলী ওঝা জানালেন, 'পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরকেই বেশি ভূতে ধরে।' কারণ হিসেবে তিনি বললেন, 'পুরুষ মানুষের বাইরে চলাচল বেশি; তারা রাত-বিরেতেও চলে-ফেরে। কোথায় দেবীর 'থান-পাট' আছে, শয়তান আছে তা তারা জানে । 'মেয়েছ্যালা'–জানেও না কোথায় কী আছে। আর তারা 'জিনিসটারে অতোখানি এলাও করে না।' মঞ্জুরের মতে মেয়েদের সাতপদের দোষ আছে বলে তাদের দিকে ভূতের আকর্ষণটা প্রবল। যেমন– মাসিকের দোষ। এর সাথে ভূতে-ধরার কী সম্পর্ক তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মঞ্জুর ওঝা দিতে পারেননি। ভূতে-ধরা নারীর আধিক্য সম্পর্কে একজন লোকসংস্কৃতিবিদের ব্যাখ্যা এরকম:'পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অসহায় অবস্থা, আর্থিকভাবে পরনির্ভরতা এবং দৈহিক-মানসিকভাবে দুর্বলতার

---

[৮] ভবানী প্রসাদ সাহু, ভূত-*ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন,১৯৯৪) পৃ.১৮১।

[৯] সুভাষ মিস্ত্রি,'ভূত *এবং* ...'লোকশ্রুতি (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৭) ত্রয়োদশ সংখ্যা,পৃ.১৬৮।

কারণে স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়ে তাতে নারী মনোবিকলনজনিত নানা রোগে ভোগে। রোগের আসল কারণ চিহ্নিত করতে না পেরে তাকে ভূতে পেয়েছে বলে ধরে নেয়।"[১০] রোগের লক্ষণ প্রকট হলে রোগী নিজেই অনেক সময় কবিরাজের কাছে আসে। এ সম্পর্কে ওঝা মঞ্জুর আলী জানালেন, প্রথমে 'ত্যালপানি' পড়ে কিংবা 'গাছান্ত' ওষুধ প্রয়োগ করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে যদি কাজ হয় তাহলে আর গানের দরকার কি? এ প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেলো, 'ওটা অন্য ব্যাপার। ও (রোগী নিজে) চাহিলে দেই।' অর্থাৎ ভূতেধরা রোগী নিজে থেকেই গান শুনতে চায়। পণ্ডিতপুরের উপেন্দ্র সিং জানালেন,'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। তাই মন্ত্র ও গান দিয়ে রোগীর মনকে চাঙ্গা করা হয়।' আফসার কবিরাজ জানালেন,'ডাকিনী-পেতিনীদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে আমরা গান করি।' জানা গেল, এ গান আগে থেকে কেউ লেখে না বা রচনা করেনা–আসরে বসেই বাঁধা হয়। গান গাওয়ার জন্যে কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত হাতে তালি দিয়ে তাল রাখা হয়। এখন আমরা এ গানের বিস্তারিত পরিচয় এখানে তুলে ধরতে পারি। ভূতের গাহনা পরিবেশনের প্রচলিত ( তবে সুনির্দিষ্ট নয় ) যে রীতিপদ্ধতি তা নিম্নরূপ:

**আসন/ আসর বসানো**

রোগীর বাড়িতে কিংবা কবিরাজের বাড়িতেই 'ভূতের গাহনা'-র আসর বসে। উঠানে রোগীকে ওঝা-কবিরাজদের সামনে পাটি বা সপের উপরে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়। ওঝা জবাফুল অথবা নিমপাতা মন্ত্রপূত করে রোগীর দুহাতের মাঝখানে রাখেন। রোগীকে সাধারণত জোড়করে নমস্কার করার ভঙ্গিতে বসে থাকতে হয়। এ ছাড়া, ধূপ, সিঁদুর, আগরবাতি, কলা এবং এক গ্লাশ পানিও রাখা হয় চিকিৎসার আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে। মড়ার মাথাও থাকে ডাকিনী-যোগিনীদের শায়েস্তা করার জন্যে। আসরে পাড়ার লোকজনকে ডেকে আনার প্রয়োজন পড়ে না; তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আসে।

**আসরবন্দনা**

আসরবন্দনা একটা লোকরীতি। এ রীতি লোকসাহিত্য-সংগীতের অনেক শাখা যেমন—কবিগান, গীতিকা বা পালাগান, জারিগান ইত্যাদি পরিবেশনের প্রাক্কালে অনুসৃত হয়। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, লোকসাহিত্যের উদ্ভবের কাল থেকেই বন্দনারীতি চালু আছে।[১১] লোককবিরা আসরে দাঁড়িয়ে কবিতা বা গীত রচনা করেন বলেই আসরবন্দনা করতে হয়। ভূতের *গাহনার* ব্যাপারেও এ কথার সত্যতা মেলে।[১২] এ গানও তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ; আসরে বসেই গাওয়া হয় এবং বন্দনা এতে অপরিহার্য । আসরবন্দনায় প্রথমেই আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, আল্লা-নবী, ফাতেমা জননী, রাম-লক্ষ্মণ কিংবা বিভিন্ন দেবদেবীর নাম জপ কেরে মন্ত্র পড়া হয়। এর মাধ্যমেই ঠিক করা হয় কোন দেবতা/দেবীর দ্বারা রোগ ভালো হবে। এ ক্ষেত্রে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই। এখানে দুএকটি মন্ত্র উল্লেখ করা হলো :

উপরে বন্দ আসমান, নিচে বন্দ খাকি

---

[১০] ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলি* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০১), পৃ. ১৮৯।

[১১] মুহম্মদ আবদুল খালেক,*মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান* (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ১২৭।

[১২] গোমস্তাপুরের ওঝা মোঃ আব্দুস সালামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ভূতের গান কেউ আগে থেকে লেখে না। উপস্থিত আসরে কথার পিঠে কথা লাগিয়ে গুরু এবং তাঁর শিষ্যরাই গায়। খাতাপত্রে কোনো মন্ত্র বা গান লেখা থাকে না।

কামের কামরুক্ষা মা বিদ্যা ধরণতরী (ধন্বন্তরি)।
পিতা বন্দ মাতা বন্দ, আসমান জমিন বন্দ
গোখরা বন্দ অলি আল্লা, গোখরা মাদার বন্দ
ফাতেমা জননী বন্দ, গোর মহাবীর চলে
চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী থাকেন তুমি ॥[১৩]

আবার, যে তারিখে শ্রী রাম-লক্ষ্মণ গেলেন অযোধ্যায়
পঞ্চবটী মথুরা নগরে।
যায়ে দেখি সারি সারি সেও তবু নাই।
রাঘমনি বিশ্বমিত্রা মহাপ্রভু আসিয়া
রোগীকে ঝাড়া দিয়া
কালী কালী অনন্ত কালী
শিব কালী দুর্গা কালী
নিখুন্দাশূর কালী
মালশূর কালী জিনশূর কালী
জিনের শাহজাদি
ধবল খাট ধবল পাট, ধবল সিংহাসন
ধবল খাটে বস্যা আছেন ধর্ম নিরঞ্জন ।
কোনবা দেশে বাড়ি তোমার কিবা তোমার নাম,
ওঠো ওঠো ধর্মমনি চক্ষু মেলি চাও,
তোমার বালকে ডাকে কাতরও পড়িয়া
কিষ্ট মুনি ঝাড়া দেয় গরুর পৃষ্ঠে হাত দিয়া,
সেই ঝাড়া পায়া বালক হইলো কাতর
উত্তরে লাগাইলাম আড়া, পোড়া মাশান
ডাহিন-যোগিনী কাট্যা করবো খানে খান
চললো আমার ক্ষুরশান॥[১৪]

এসব মন্ত্র দিয়ে শুরু হলেও ভূতে-ধরা রোগীর চিকিৎসা প্রক্রিয়ার প্রধান আকর্ষণ আসলে গান। প্রায় পঞ্চাশ রকম গান একই আসরে পরিবেশিত হয়। তবে প্রথমেই থাকবে বন্দনা গান। গানে আল্লাহ-রসুল, পীর-মুর্শিদ, পিতা-মাতা, শিক্ষাগুরুর চরণ বন্দনার কথা যতই থাক আসলে এতে দেবীবন্দনাই মুখ্য। বিদ্যাদেবী সরস্বতী বন্দনা দিয়ে কোন কোন আসর শুরু হয়। কাঁকনহাটের ওঝা সেকান্দার আলীর একটি বন্দনা গান এরকম:

হা রে.....
সরস্বতী বিনে গতি মা তোকে না দেখি চোখেতে।
জোড়হাতে মিনতি করি মা তোকে আমি
জোড় হাতে ...এ ...এ
পদ্মপাতে জনম আরে মা তোর
পদ্ম নাম কুমারী ...এ ... ।

---

[১৩] নিজস্ব সংগ্রহ। মির্জাপুর, নাচোলের আফসার কবিরাজের গান।
[১৪] নিজস্ব সংগ্রহ। পণ্ডিতপুর, নাচোলের জিতেন্দ্র সিং-এর গান।

বাঁশের আড়ায় খ্যাচো, ও নামো রে
শিব জয়মঙ্গল বাশুলী।
আগে চলে গুরু মায়ের পিছে চলে শিব
ধরেছি মা রাঙ্গা চরণ মা তোর
পহেলাতে জনম আরে মা তোর
কালিদহ সাগরে।
তবু কেন আস আরে মা তুমি
হয়ে গোটা গোটা
নাম্যা আইস আরে বেটি
দিব কালের ফোঁটা।[১৫]

মহারাজপুরের মঞ্জুর আলী মণ্ডলের বন্দনাগান আবার একটু ভিন্ন। যেমন—

প্রথমে বন্দিলাম প্রভু ধর্ম নিরঞ্জন
জল-যশোদা বন্দ্যা নাইবো লক্ষ্মী-নারায়ণ।
হংস ব্রম্ভা (ব্রহ্মা) বন্দ্যা নাইবো গাড়লের বাহনে।
বিষকের বাহনে বন্দি দেবতার লোচনে।
অশীলা শীল মতি বন্দি কনক বরণে
কনেক লঙ্কাপুরে বন্দি রাজা দশাননে।
সাগর-সাগরানী বন্দি চিত্তে বারানসী
স্বর্গেরই কপিলা বন্দি আজ্ঞেররি তুলসী।[১৬]

এভাবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, দশরথ, বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা, নারদ, হুতাশন নদী,মহাকালসহ অনেক কিছুরই বন্দনা করা হয়। বোঝা যায়, ওঝা-কবিরাজদের পুরাণ এবং শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্টই রয়েছে।

## আবাহনী

ভূতের গাহনায় সাধারণত কোনো না কোনো দেবদেবী বা ডাকিনী-যোগিনীকে আহ্বান করা হয়। ভূত বিশেষজ্ঞের মতে, ডাকিনী-যোগিনী কোনো ভূত নয়, দেহধারী নারী বা শিব-দুর্গার অনুচর মাত্র।[১৭] ডাকিনীরাই লোকসমাজে *'ডাইনী'* বলে পরিচিত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ডাকিনীরা অমঙ্গল করে এবং সেজন্যেই তারা ভূত পদবাচ্য। আমাদের সমীক্ষিত অঞ্চলের আধিকাংশ ওঝার গানেই দেবীপ্রাধান্য তথা শক্তিপ্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। তানোরের একটি জায়গার নাম 'মুণ্ডুমালা'। লোকশ্রুতি আছে,এখানে একদা নরমণ্ডুর মালা পরিয়ে কালীকে খুশি করতে হতো । এখনো নাচোলের পণ্ডিতপুরের ওঝা উপেন্দ্রনাথ এবং জিতেন্দ্র সিং কালীকেই শক্তি হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা কালীর আবাহনীই আগে গান। তাঁরা মনে করেন কালীই বিভিন্নরূপে রোগীদেরকে ধরে । এজন্যেই কালীর নাম জপ করে করে তাকে খুশি করা হয়। কালীকে আহ্বানসূচক একটি গান এ রকম:

ঝিম কালী ঝিম গে
তুই কালী মা সোনা গে
খেলবি যদি আয় আসনে।

---

[১৫] নিজস্ব সংগ্রহ। কাঁকনহাট, গোদাগাড়ীর সেকান্দার ওঝার গান।

[১৬] নিজস্ব সংগ্রহ। মহারাজপুরের ওঝা মঞ্জুর আলী মণ্ডলের গান।

[১৭] মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সংকলিত 'ভূতের বায়োডাটা', সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৮।

ও যে মাঠে পাড়ো খাট-পালঙ্কা
শ্মশান পাড়ো নিন্
আহা রে যোগিনী তোর জানিনারে ঘিন।
ঝিম কালী ঝিম গে...।[১৮]

এ ভাবে নানা বিশেষণ প্রয়োগ করে নানা ভঙ্গিতে দেবীকে আসরে আহ্বান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পণ্ডিতপুরের ওঝারা নিজেরাও অগ্রহায়ণ মাসে বামাকালী পূজা করেন। তাঁদের কালী মন্দির নেই তবে দেবীর থান আছে; সেখানেই কালীমূর্তি বানিয়ে কোনো ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে পূজা করা হয়। তারা মনে করেন, দেবী থাকেন শ্মশান ঘাটে। সেখান থেকে দেবী কীভাবে আসেন সে বৃত্তান্ত 'হাওয়া-বাতাসের' রোগীকে তারা গানের মাধ্যমে জানান দেন:

এ বিলেতে চরে রে পাখি ঐ বিলেতে যায়
উড়ে যাবার কালে গে পাখি পাগলা খালি পায়।
সে নারে চিকনও সুতা লোহা হতে দড়
ওরে তুই রে কালী যোগিনী টান্যা করবো জড়ো
ওরে তুই রে সতীসা দেবতা টান্যা করবো জড়ো।[১৯]

এভাবেই দেবীকে আসরে আহ্বান করা হয় কিংবা বলা যেতে পারে নেমে আসতে বাধ্য করা হয়। গানের ভাষায় এবং সুরের সম্মোহন ক্ষমতায় সেরকমই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আবাহনী অংশের গানগুলোতে মূলত দেবীকে সন্তুষ্ট করার একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকে। ডাকিনী-যোগিনীকে প্রথমে 'মা' সম্বোধন করে বিনয়বিগলিত হয়ে তাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করা হয়। দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত নিতান্ত অনুনয়-স্তোক বা তোষামোদপূর্ণ একটি গানের উল্লেখ করা যাক:

দেবী আয় মা আয় মা আমার আসনে,
ধুলায় পড়ে কাতর হয়ে ডাকছি বারংবারে।
মাকে আনতে যাবো গো ক্ষীরনদীর কূল,
ঘাড়ে দিব লাল গামছা চরণে জবার ফুল।
মাকে পূজবো পূজবো ভ্যারোলার দহে
লাল জবার ফুল দেব চরণও দুখানে।
আহা চিড়্যা বান্দ্যা দে মাগে গামছা বান্দ্যা দে
ফুল তুলতে যাবো আমরা ললিত বনে।[২০]

আবার কোনো কোনো গানে দেবীকে সম্বোধন করা হয় 'সোনার যাদু' বলে। কখনো বা 'সঙ্গের সঙ্গিনী', 'দিদি', কিংবা 'দাদা' হওয়ারও অনুরোধ করা হয়। আল্লা-রসুলের দোহাই দিয়ে তা মেনে নেওয়ার জন্যে অনুনয় করা হয়। কি কি জিনিস পেলে দেবী খুশি হবেন এবং কয় রাত কয় দিন 'গাহনা' শুনতে চান তা-ও জিজ্ঞাসা করেন ওঝারা। সর্বোপরি দেবীর প্রকৃত পরিচয় জেনে নিতে চান তারা:

সঙ্গের সঙ্গিনী মোর হবি
সঙ্গে খেলা করবো আহা রে।
দিদি হলি কি দাদা মোর হলি

---

[১৮] নিজস্ব সংগ্রহ। পণ্ডিতপুর, নাচোলের জিতেন্দ্র সিং-এর গান।
[১৯] তদেব।
[২০] তদেব।

পরিচয়ও দিবি আহা রে।
গান লিবি কি বাজনা মোর লিবি
জবান খুইলা বলবি আহা রে,
জবান খুলো বাকি মোর বলো
শুনি তোর কাহিনী আহা রে,
কয় রাত কয় দিন গাওনা মোর শুনবি
মুখের জবান বলবি আহা রে।[২১]

নাচোলের আন্ধারাইল গ্রামের ওঝা মোঃ জামিনুর রহমান ও তাঁর শিষ্য খোকন মনে করেন দেবীর উদ্দেশ্যে গান করলে দেবী খুশি হন। ওরা বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত মেয়েলী গীত বা বিয়ের গানের কথা ও সুরের সঙ্গে মিলিয়ে যে গানখানি শোনালো তা এরকম:

আরে হলদি কুটুম মেন্দি বাটুম পরাইবো অঙ্গেতে,
কী সুন্দর লাগে অঙ্গ দেখিতে, নাচনও দেখিতে।
গুলাপিরও পাটের শাড়ি ঝলমল করে
গুলাপিরও কানের দুল ঝলমল করে।
কী সুন্দর লাগে অঙ্গ দেখিতে, নাচনও দেখিতে।[২২]

সুরে সুরে আদ্যাশক্তিরূপিণী দেবীকে বার বার সকাতর ও সনির্বন্ধ আহ্বান করা হয় এ জন্যে যে রোগীকে সুস্থ করে দেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। এ কারণে দেবীকে তাঁর থান বা মোকাম ছেড়ে রোগীর শরীরে ভর করার জন্য মিনতি জানানো হয় এভাবে:

হুঁ-হুঁ-হুঁ ... হুঁম!
এসো এসো সোনার যাদু
ছাড়ো ছাড়ো সোনার পালংরে...হুঁম্ !
থানো ছাড়ো পাশো ছাড়ো
ছাড়ো নিজের মোকাম রে।
কার বা দোহাই দিবো রে জানি সোনার যাদু
ভর কর ভর কর সোনার যাদু
শিরে ভরও করবি রে হুঁম।
হস্ত কাঁপায়ে আসবি সোনার যাদু
রুগী পাগল কর‍্যা রে।
কোন খ্যালা না জান সোনার যাদু
সে খ্যালা না খেলবি রে হুঁম![২৩]

কী কী রূপে ডাকিনীরা আসরে আসেন পণ্ডিতপুরের ওঝাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা জানান–কালী, মনসা, মাশান, শিবকালী, কার্তিক, গণেশ, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীরূপে জিন-ভূতেরা আসরে অবতীর্ণ হন। দেবী যখন আসরে নামেন তখন যে-সব গান গাওয়া হয় তার একটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো:

দেবী নামলো নামলো অবলার কুমারে,

---

[২১] নিজস্ব সংগ্রহ। টিকরা, মহারাজপুরের আমির কবিরাজের গান।
[২২] নিজস্ব সংগ্রহ। আন্ধারাইল, নাচোলের ওঝা জামিনুরের শিষ্য খোকনের গান।
[২৩] নিজস্ব সংগ্রহ। আমির কবিরাজের গান, পূর্বোক্ত।

ডাহিন হাতে খড়্গ খাঁড়া বামে বাজায় তালে।
নাম্যাছে নাম্যাছে আমার জ্বীনেরও না ছেল্যা,
নাম্যাছে নাম্যাছে আমার পরীরও না ছেল্যা,
নাম্যাছে নাম্যাছে আমার কালীরও না ছেল্যা,
দেবী নামলো নামলো অবলার কুমারে... ।[২৪]

'দেবী নামলো নামলো অবলার কুমারে'–ধুয়াটি বার বার গাওয়া হয়। কাঁকনহাটের ওঝা সেকান্দার আলী গানটি গাওয়ার পর নিজে থেকেই বললেন,'শর্টকাটেই সার‍্যা দিল্যাম।' মানে এটি বেশ বড় গান–সবটা না গেয়ে সংক্ষেপে সারলেন। তিনি আরো জানালেন, এ গানটি জিনেধরা রোগীর চিকিৎসার জন্যে । এভাবেই জিন-ভূতের দেবীকে আসরে নামিয়ে আনা হয়।

**দেবীর বিদায়**

আসরে নামিয়ে আনার পর রোগীর উপর ভর-করা ভূতের দেবীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, সে রোগীকে ছেড়ে যাবে কি যাবে না? পণ্ডিতপুরের ওঝা জিতেন্দ্র সিং এ সম্পর্কে বিরূপ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার উদাহরণ দিলেন। কোনো ক্রুদ্ধ স্বামী যেমন স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয় ওরকম ওঝারাও পেত্নীকে তাড়ায়। তবে প্রথমে ভদ্রভাবেই চলে যেতে বলা হয়। না গেলে বিদ্রূপ এবং অপমান-অপদস্তও করা হয়। যেমন—কখনো ডাকিনীকে *মা* সম্বোধন করে গান শুরু হলেও আস্তে আস্তে দেখা যায় অপমানসূচক নামে তাকে ডাকা হচ্ছে। রোগীকে ডাকিনীর ভরমুক্ত করার জন্যে গানে ক্রমশ এমন উক্তি করা হয় যাতে সে দ্রুত রোগীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। মহারাজপুরের ওঝাদের মুখে শোনা গেল এমনি একটি গান:

এ মা ফুলে বন্দি ফুলে আয় মা
তোর ফুলেরও রণি (রেণু) গে,
... ... ... ...
গ্যান্দা ফুলে খ্যালা মোর করে
খ্যালান্যা ডাকিন গে।
চাঁপা ফুলে খ্যালা মোর করে
চালান্যা ডাকিন গে।[২৫]

এভাবে টগর ফুলে 'টালন্যা',শিমুল ফুলে 'আহ্লাদ্যা' এবং সব শেষে 'মাতান্যা' মানে *মাতাল* বলে দেবীকে সম্বোধন করে গান করা হয়। 'এ মা ফুলে বন্দি ফুলে আয় মা/ তোর ফুলেরও রণি গে'–এ ধুয়া দোহাররা বার বার গেয়ে যান। নাচোলের ওঝা জামিনুর রহমানের শিষ্য খোকন আমাদেরকে জানিয়েছেন, ফুলের নাম করে গান দিলে আনন্দ পেয়ে *ওরা* অর্থাৎ পেত্নীরা চলে যেতে চান। এ ধরনের গানকে ওঝারা বলেন 'আসনে টান দেওয়া গান' কিংবা 'খেলান্যার গান।' রোগীরা শুনতে চাইলে এ গান শোনানো হয়। যেমন—

আরে তেলির বাড়ির তেলরে ডুবানি
মালীর বাড়ির ফুল,
পেতিনির আইল্যা ঝাইল্যা রে চুল—
পেতিনির বাইন্ধ্যা দিবোরে খুপা

---

[২৪] নিজস্ব সংগ্রহ। সেকান্দার কবিরাজের গান, পূর্বোক্ত।
[২৫] নিজস্ব সংগ্রহ। আমির কবিরাজের গান, পূর্বোক্ত।

আরে সেইনা খুপায় দিবোরে আমরা
লাল জবার ফুল।
আরে সেইনা খুপায় দিবোরে আমরা
লাল গোলাপ ফুল। (ইত্যাদি)[২৬]

একের পর এক এভাবে গান গাওয়াতে রোগীর কী উপকার হয় জানতে চেয়েছিলাম সালিম ডোল পাড়ার ওঝা মঞ্জুর আলী মণ্ডলের কাছে। তিনি একটি গান শুনিয়ে বললেন, "এ গান শুনতে শুনতেই ভূত মগ্ন হয়ে যায়।" মজার ব্যাপার হলো, যে-সকল দেবদেবী ভূত হয়ে রোগীর উপর ভর করেন সে-সকল দেব-দেবীকেই গান গেয়ে বশে আনেন ওঝারা। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, এ গান যে একটানা সুরতরঙ্গের সৃষ্টি করে তা রোগীর আচরণকে প্রভাবিত করে। মঞ্জুর আলীর গাওয়া একটি গান এরকম:

এ মা...
জিন কি পরী হলি মা গে তোরা
এ মা আঁতুড়্যা ডাকিন গে।
এ আতুড়্যা কি হুলুইর‍্যা
এ কালো কালো চতুইরা গে।
এ দেব-দেবতা হলি মাতা মা
এ মা জিনের চেলা তোরা গে।

... ... ...
এ মা শিমুল গাছে বইস্যা মা
এ মা শিমুল খ্যালা করিস গে।
এ লাগলো নদী শিব চোখে মা
এ মা সিঁথায় দেবো ফোঁটা গে।
এ তুলসীর পাতা দিয়া তোকে মা
ও আল্লার হাদিস দিব গে।
এ আল্লার কোরান লিয়া তোরা মা
এ মা যাবি যে বিদায়ও গে।[২৭]

অদৃশ্য এ-সব ভূত-পেত্নীরূপী মায়েরা বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত রোগীর অস্বাভাবিক আচরণ বন্ধ হয় না। পর্যায়ক্রমে ডাকিনীকে গালি-গালাজ করতে থাকলে রোগী আরও রং-তামাশার গান শুনতে চায়।

প্রতিটি গানেই আছে ডাকিনী-যোগিনীদের কথা। এদের আবার আলাদা আলাদা নামও রয়েছে। যেমন—হলুইদ্যা (হলদে), খাচ্ছইর‍্য (খচ্চর থেকে যার জন্ম ),পচ্ছেড়্যা (দুষ্ট), আঁতুড়্যা ( আঁতুড় ঘর থেকে যে ডাকিনী রোগীর উপর ভর করে), চালইন্যা (কেউ কারো উপর ভূত/ জিন চালান করতে পারে), বেহায়া, খ্যালাইন্যা ইত্যাদি। এভাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ অনুযায়ী ডাকিনীর নাম হতে পারে: 'হাসিন্যা', 'নাচিন্যা','কান্দিন্যা', 'রাগিন্যা','ডাহিন্যা'( যে ডান দিকে ছোটে ),'বাঁইয়্যা' (বাম দিকে যার গতি), কিংবা 'শ্মশান্যা' (শ্মশানে থাকেন যিনি)। যাহোক, এ-সব বিচিত্র নামের ডাকিনীরা সহজে নড়ে না কিংবা সরে না রোগীর ঘাড় থেকে। এ জন্যে ওঝারা প্রথম দিকে যতই তোষামোদ করুন গানের শেষ পর্যায়ে এসে প্রথমে ভয় দেখান ও হুমকি দেন। তারপর অপমানসূচক

---

[২৬] নিজস্ব সংগ্রহ। জামিনুরের শিষ্য খোকনের গান, পূর্বোক্ত।
[২৭] নিজস্ব সংগ্রহ। মঞ্জুর আলী মণ্ডলের গান, পূর্বোক্ত।

সম্বোধন শুরু করেন এবং অনেক সময় অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজও করেন। যেমন—পণ্ডিতপুরের ওঝা জিতেন্দ্র সিং তার গানে বীর হনুমান কর্তৃক লঙ্কা ঘেরাও এবং দুষ্ট রাবণ রাজার নাকাল হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ডাকিনীকে এভাবে ভয় দেখান:

ও কালী পালা পালাহ্ রে নঙ্কা ঘেরিল হনুমান
ও মাশনা পালা পালাহ্ রে নঙ্কা ঘেরিল হনুমান।
যোগিনী পালা পালাহ্ রে নঙ্কা ঘেরিল হনুমান
আরে ছয় লক্ষ পুত্র তাহার সোয়া লক্ষ নাতি,
আরে একে একে বংশে দিতে না রাখিব বাতি।
ও বাড়ির পাশে বাঁশের ঝাড় ধনুক দিব টান।
আরে এপার থেকে ওপার যেয়ে পালালো বেঈমান।
ওরে আমার সাথে করতে গেলে বেঈমান
করবো খানে খান।[২৮]

গানটি গাওয়ার পর জিতেন্দ্র নিজে থেকেই আরো বললেন,"মানে আমি হনুমান সেজে গেলাম তবু আমি নঙ্কাকে উদ্ধার করবোই। এ অবস্থায় রোগী পালাতে চাইবে। রোগীর ঘাড়ে ভর-করা কালী কি যোগিনী নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে চলে যাবে।" এরপরেও যদি না যায় তখন শুরু হয় অপমানসূচক এবং গালিগালাজপূর্ণ গান। এখানে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

আগে গোল্লা পাছে পা
আহ্লাদ্যা ডাকিনী খেলগে মা
খেল কদম্ব বাতাসে হেলে গা।
আগে গোল্লা পাছে পা
মাতান্যা ডাকিনী খেলগে মা।[২৯]

এভাবে ঐ গানেই পর্যায়ক্রমে 'আঁতুড়্যা', নানকুড়্যা'( অবৈধ কর্মকারিণী) ,'হারামি', 'অসতী' ইত্যাদি নামে ডাকিনকে অভিহিত করা হয়। চাঁপাই নবাবগঞ্জের যে-কটি এলাকায় আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি তার সবখানেই ওঝাদের কাছে গালি-গালাজপূর্ণ গান শুনতে চেয়েছি। কেউই প্রথমে রাজি হয়নি বিশেষত পারিবারিক পরিবেশে ওরকম গান তারা একদম শোনাতে চাননি। কেউ কেউ বলেছেন, "বাড়ির মেয়েরা কাছে থাকলে ওটি শোনানো যাবে না কিংবা জমজমাট আসর ছাড়া ও গান মুখে আসে না।" ধর্মপ্রাণ মুসলমান ওঝা-কবিরাজেরা বলেন, "মুসলমান হয়ে মন্ত্র বা গান করলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়; ঈমানও নষ্ট হয়।" গালি মিশ্রিত গানের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নাচোলের আন্ধারাইল গ্রামের ওঝা জামিনুর রহমানের শিষ্য খোকন জানান, "ওগুল্যা বলতে হয় না। আমরাও জানি, তবে আমাদের সমাজে চলে না। কেউ কেউ ওখে (মানে ডাকিনীকে) রাগানোর জন্য বংশ তুল্যা গালি দেয়।" আমাদের উপর্যুপরি অনুরোধে শেষমেষ অশ্লীলতামুক্ত একটি গানের ক-লাইন শোনালেন:

তুরা কোন কোন ফুলে খেলাবি গে মা
আমের বানিয়া চলে না।
তুরা ভালোই বংশের ছাইলা গে মা।
তুরা ধর্মের মাথা খাইসন্যা গে মা।...।[৩০]

---

[২৮] নিজস্ব সংগ্রহ। জিতেন্দ্র সিং-এর গান। পূর্বোক্ত।
[২৯] নিজস্ব সংগ্রহ। আমির কবিরাজের গান, পূর্বোক্ত।
[৩০] নিজস্ব সংগ্রহ। জামিনুরের শিষ্য খোকনের গান, পূর্বোক্ত।

খোকন না শোনালেও কাঁকনহাটের ওঝা সেকান্দার আলী লাজ-শরম ঝেড়ে একটি গান গাইলেন। গানটি শোনার পর 'বিলাসী' গল্পে সাপের দংশনে মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে বাঁচাতে-আসা ওঝাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যটি মনে পড়তে পারে: 'যখন দেখা গেল ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত।'[৩১] সেকান্দার ওঝার গানটি সাপে-কাটা এবং ভূতে-ধরা উভয় রোগীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। ভূতে-ধরা রোগীরা যে সবাই গানথেরাপিতে ভালো হয়ে যায় তা নয়। 'ভূতের গাহনা' ব্যর্থ হলে মনে করা হয় রোগীর কাছে 'মনসা' বা 'সাপা' আছে। তখন গান পরিবর্তন করে 'সাপা-মনসার' গান ধরা হয়। তবে তার আগে বাড়ির আঙিনায় একটি ছোট্ট পুকুর কাটতে হয়। প্রায় বুকসমান খুঁড়ে তাতে পানি ঢেলে দিলে রোগী আপনা আপনিই ঐ পানিতে গিয়ে নামে। পুকুরে নামলেই রোগী ভালো হবে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে। গানটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক:

অষ্টগিরি লাগে রে দোহাই রে
বাসুকীর মুণ্ডু খাইস,
অসতী ছিনালের বেটিরে বেপর্দা
ভাইগন্যা ভাতারি।
আরে মাগী লজ্জা নাইরে তোর,
কচুর বনে থাক্যা রে মাগী এতো গুমান তোর?[৩২]

বিষটাকে লজ্জা দেওয়ার জন্যেই নাকি গালিগালাজ করা হয় যাতে বিষ আর উপরে উঠতে না পারে। আর 'ওরা' মানে পেতিনি-ডাকিনীরা যখন কথা শোনে না তখনই এ ধরনের অকথ্য ভাষার গান গাইতে হয়। জিতেন্দ্র সিং-এর একটি সাপার গানে দেখা যায় মনসাকে 'বাসাইনী','চামানী 'এবং 'ম্যাথরনী' বলে অপদস্ত করা হচ্ছে। যেমন:

ও খেলা করে মনসা খেলা করে,
কে খেলা করে বাসাইনী খেলা করে
কে খেলা করে চামানী (চামারনী) খেলা করে
কে খেলা করে ম্যাথরনী খেলা করে।[৩৩]

এতো অপমান-অপদস্ত করার পর ডাকিনীরা রোগীকে ছেড়ে যখন চলে যান তখন যে ধরনের গান গাওয়া হয় তার একটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা যাক। এটিকে বিদায় জানানোর গান বলা যেতে পারে:

জলে-ফুলেতে আসন সাজানা দিলাম,
আজকের মতন কালী-মাশানা শ্মশানে চলেন।
উত্তর-দক্ষিণে আসন সাজানা দিলাম,
আজকের মতন কালী শ্মশানে চলেন।
কামের দোহাতে (দোহাই) আসন সাজানা হলো,
আজকের মতন মাশানা শ্মশানে চলেন।
মায়ের দোহাতে আসন সাজানা হলো,

---

[৩১] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিলাসী'–আবদুল মান্নান সৈয়দ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *উচ্চ আধ্যমিক বাংলা সংকলন* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ১৯৯৮), পৃ. ৯৮।

[৩২] নিজস্ব সংগ্রহ। সেকান্দার আলীর গান, পূর্বোক্ত।

[৩৩] নিজস্ব সংগ্রহ। জিতেন্দ্র সিং-এর গান, পূর্বোক্ত।

আজকের মতন মাশানা শ্মশানে চলো।[৩৪]

এভাবে পর্যায়ক্রমে পিতার, রামের, গুরুর, শিশুর এবং ছত্রিশ কোটি দেবতার দোহাই দিয়ে আসন সাজানোর কথা বলা হয়। লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃত গানটিতে বার বার 'মাশানা' বা 'মাশান'-এর কথা বলা হয়েছে। এ 'মাশনা' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে কাঁকনহাটের ওঝা সেকান্দার আলী যা বলেন তাতে কেউ একেবারে থ বনে যেতে পারেন কিংবা কারো কারো পিলে চমকে যেতে পারে। সেকান্দারের ভাষ্যমতে, 'মাশনা' হলো মানুষের মাথা মানে মরা মানুষের মাথা । তাও আবার যারা শনি-মঙ্গলবারে মারা যান তাদের মাথা। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে শ্মশানে / কবরে গিয়ে এ মাথা কেটে নিয়ে এসে (সেকান্দার নিজেই এ কাজ করেন বলে জানালেন! গুরু বিধানের নিয়মানুযায়ী ঐ সময় পরনে কোনো রকম কাপড় থাকেনা এবং পা দিয়ে মাথা কাটতে হয়।) ধূপ-সিন্দূর-কর্পূর দিয়ে মন্ত্রপূত করে একে সাত দিন জাগাতে হয়। মরা মানুষের মাথা বা মাশনা দরকার হয় এ জন্যে যে, ওঁটাকে মন্ত্রপূত করে চালান দিলে যা বলা যাবে তাই করবে। বিশেষত প্রতিপক্ষ কোনো ওঝা-কবিরাজের বাণ-উচাটন ঠেকানোর ব্যাপারে একে কাজে লাগানো হয়। আন্ধারাইল গ্রামের ওঝা জামিনুরের মতে মৃত ওস্তাদ বা গুরু লোকের মাথাতেই উৎকৃষ্ট মাশনা তৈরি হয়। আসলে এভাবে মাশনা বানানোর পর ওটি নিজেই একটি ভূতে পরিণত হয়। লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী এরা অমঙ্গলকারক এবং রক্তমাংসভুক। ভূত বিশেষজ্ঞের মতে, "শ্মশান ' থেকে 'মশান' হয়ে শব্দটির উৎপত্তি বাংলাদেশের রাজশাহীতে। কোচবিহারে মশান ঠাকুর নামে লৌকিকদেবতা থাকলেও গাঁ-গঞ্জে 'মাশনা' বলতে এক শ্রেণীর ভূতকেই বোঝানো হয়ে থাকে।"[৩৫] যাহোক, অনেক ভূতের গাহনাতেই এ মাশনার কথা থাকে। ছত্রিশ কোটি দেবতার দোহাই দেওয়ার পরও যদি 'মাশনা-মাশনীরা' বিদায় না নেয় তবে সর্বশেষ মন্ত্র দিয়ে তাড়ানো হয়। মন্ত্রেও যদি কাজ না হয় তো শুকনা মরিচের গুঁড়া রোগীর নাকে-মুখে-চোখে ডলে দিলেই ভূত-পেত্নীরা সব পালিয়ে যায়। অবশ্য ডাকিনী-যোগিনী আর মাশনা-মাশনীদের কাছে ওঝা-কবিরাজদের পরাজয়ও ঘটে মানে চিকিৎসা ব্যর্থ হলে রোগী মারা যায়। এমনটি ঘটার কথা ওরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন।

ভূতে-ধরা রোগীর চিকিৎসা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে জানা গেছে, দেবীর পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা রোগীর অস্বাভাবিক আচরণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত গান চলতে থাকে। একই আসরে প্রায় পঞ্চাশ রকমের গান করেন বলে জানালেন মহারাজপুরের আমির কবিরাজ। একনাগাড়ে এক-দুই দিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত গান চলতে থাকে। গুণীন-ওঝারা বিড়ি-সিগারেট-পান-তামাক খাওয়ার জন্যে গানের মাঝখানে বিরতি দিয়ে থাকেন। রোগী যতক্ষণ গান শুনতে চাইবে ততক্ষণ গান চলবে। প্রচলিত লোকসংগীতের যে সরল সুর কাঠামো 'ভূতের গাহনারও' তাই,তবে এ গানের সুরের বৈচিত্র্য, তাল ও মাদকতা শ্রোতাকে সহজেই আকৃষ্ট করে এবং কেমন একটা যেনো ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়।

**উপসংহার**

চাঁপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলের *ভূতভাগানো গান* লোকচিৎসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যান্য লোকসংগীতে যেমন নিছক অনাবিল আনন্দে সুরতরঙ্গে ভেসে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে ভূত তাড়ানো গানে আনন্দটা হয়তো মুখ্য নয়, প্রয়োজনটাই মুখ্য। তবু লক্ষ করা গেছে চিকিৎসার দরকারি দিকটা মিটিয়েও ঐ এলাকার ওঝারা ভূতের গান গেয়ে মনে আনন্দ পান, সুখ পান। কবিরাজি কিংবা ওঝাগিরি তাদের আসল পেশা না হলেও তারা একে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। তারা মনে করেন ডাক্তারি চিকিৎসা যখন ব্যর্থ

---

[৩৪] তদেব।

[৩৫] মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সংকলিত 'ভূতের বায়োডাটা',পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৩।

হয় তখনই ভূতে-ধরা এবং সাপে-কাটা রোগীরা তাদের শরণাপন্ন হয়। এ চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে উঠে যাবে না বলেও তারা দাবি করেন। ভূতেধরা রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে ওঝাদের উপর লোকসাধারণের বিশ্বাস এখনো পর্যন্ত অটুট আছে এবং এতে গুরুপরম্পরা আছে বলে এটি সহজে বিলুপ্তও হবে না। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতিবিদগণের অনেকেই মনে করেন, লোকঔষধ এবং লোকচিকিৎসা আমাদের লোকসংস্কৃতির একটি বিলীয়মান উপাদান হলেও গ্রাম-সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে এর মূল্য ও কদর কমেনি।[৩৬] একে অবাস্তব, আজগুবি কিংবা নিছক সংস্কার বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। কেননা দীর্ঘকাল ধরে লোকসমাজ এ চিকিৎসা পদ্ধতির সুফল ভোগ করে আসছে।[৩৭] জিন-ভূতেধরা কিংবা সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসায় আমরা মন্ত্র প্রয়োগের ব্যাপারটিও লক্ষ করেছি। মন্ত্রের মধ্যে আছে জাদুশক্তি।[৩৮] এতে গীতিকবিতারও স্বভাব নিহিত বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৩৯] আমাদের সমীক্ষিত অঞ্চলের ওঝারা যে 'ভূতের গাহনা' করেন তাতেও মন্ত্রের প্রয়োগ আকসার ঘটে থাকে। মন্ত্রের জাদুশক্তি এবং গানের সুরতরঙ্গের দোলা মিলিয়ে ভূত নামানোর আসরে যে আবেশের সৃষ্টি হয় তার একটা ইতিবাচক প্রভাব রোগীর উপরে পড়ে। হয়তো বা এ 'সুর-থেরাপিতেই' রোগীরা মানসিক সুস্থতা অর্জন করে। বর্তমান প্রবন্ধকারের সংগীতের ব্যাকরণজ্ঞান তেমন নেই বললেই চলে। তাই ভূতের *গাহনার* তাল-লয়-মাত্রা তথা সাংগীতিক দিকটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলো না। এদিক থেকে এ গানের পরিচয় প্রদান ও প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন অসম্পূর্ণই থেকে গেলো।

যেসব ওঝা-কবিরাজ ভূতে-ধরা রোগের চিকিৎসার সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা নিতান্তই খেটেখাওয়া মানুষ।। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার সুফল সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যেদিন পৌঁছাবে অথবা সর্বরোগহর ঔষধ আবিস্কৃত হবে সেদিন হয়তো ভূতভাগানো *গান* শুধুই ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে ঠাঁই পাবে। তবে এখন পর্যন্ত গ্রাম-সমাজের সাধারণ মানুষের মনোজগতে এবং ওঝা-কবিরাজদের কাছে জিন-ভূতের কারসাজি একটা বড়োই কৌতুক ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হয়ে আছে। 'ভূতভাগানো গান' অবলম্বন করে ওঝাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, বাঙালি লোকমানস তথা পিছিয়ে-পড়া সংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর মনোজগতের তত্ত্ব-তালাশ করাও হয়তো সম্ভব হবে। এজন্যে আরো ব্যাপক ও নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন।

---

[৩৬] বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী, *লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি,২০০৩) প্রাক্‌কথন দ্রষ্টব্য।

[৩৭] তদেব, পৃ.১২-১৩।

[৩৮] ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলি* (ঢাকা: গতিধারা,২০০১), পৃ. ১৯০।

[৩৯] মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকচিকিৎসায় তন্ত্রমন্ত্র* (ঢাকা:বিশ্বসাহিত্য ভবন,২০০১) পৃ. ৫২।

## আইবিএস প্রকাশনা

### পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

*আইবিএস জার্নাল* (বাংলা), ১৪০০:১-১৪১২-১৩

*ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য* (সেমিনার : ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

*বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা* (সেমিনার : ৬), আমানুল্লাহ আহমদ (১৯৮৫)

*বাঙালীর আত্মপরিচয়* (সেমিনার : ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা* (সেমিনার : ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

*বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল)*, ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

### Journals and Books (in English)

***The Journal of the Institute of Bangladesh Studies***, Vols. I-XXIX (1976-2006)

***Reflections on Bengal Renaissance*** (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

***Studies in Modern Bengal*** (Seminar Volume 2), edited by S.A.Akanda (1984)

***The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905-1911)*** by M.K.U.Molla (1981)

***Provincial Autonomy in Bengal*** (1937-1943) by Enayetur Rahim (1981)

***The District of Rajshahi : Its Past and Present*** (Seminar Volume 4), edited by S.A.Akanda (1984)

***Tribal Cultures in Bangladesh*** (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

***Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh*** (Seminar Volume 8) edited by S.A.Akanda & M. Aminul Islam (1991)

***History of Bengal : Mughal Period, Vols. 1 & 2*** by Abdul Karim (1991, 1995)

***The Institute of Bangladesh Studies : An Introduction*** (2004)

***The Journal of the Institute of Bangladesh Studies : An Up-to-date Index*** by M. Shahjahan Rarhi (1993)

***Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses*** Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

***Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm*** edited by Priti Kumar Mitra & Jakir Hossain (2004)

# ১৩শ সংখ্যার সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| মোঃ মনিরুল হক ॥ মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | প্রথম মহীপালের রাজভিটা শিলালিপি : পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ | ০৭ |
| মো. ফজলুল হক ॥ | উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) : বাংলাদেশ রেজিমেন্টের ভূমিকা | ১৩ |
| মো. রেজাউল করিম ॥ | ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার লবণ শিল্প : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা | ২৯ |
| মো. শামসুজ্জোহা এছামী ॥ | মুসলিম শাসনামলে বাংলায় প্রবর্তিত ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ | ৪৯ |
| মোহাম্মদ বশির আহম্মদ ॥ | ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র নেতৃত্ব | ৫৭ |
| মো. ফায়েকউজ্জামান ॥ | মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি : প্রসঙ্গ মধ্যপ্রাচ্য | ৬৯ |
| শফিকুর রহমান ॥ | শহীদ সাবেরের 'আরেক দুনিয়া থেকে': ১৯৫০-এর দশকের জেলজীবন | ৮১ |
| সরকার আমিন ॥ | আল মাহমুদের জীবনবোধ | ৯৩ |
| গৌতম কুমার দাস ॥ | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : দুর্ভিক্ষের চিত্র | ১০৩ |
| মোহাং শাহ্ কামাল ভূঁঞা ॥ | বিশ শতকে নারী রচিত বাংলা উপন্যাসে নারী-শিক্ষার স্বরূপ | ১১৯ |
| বিলকিস বেগম ॥ | নকশি কাঁথার সামাজিক, ব্যবহারিক ও কাব্যিক মূল্য | ১৩১ |
| কানিজ ফাতেমা কানন ॥ | গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা-ক্ষমতায়ন : একটি গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা | ১৩৯ |
| মোঃ ওমর ফারুক ॥ | প্রবাসী কর্মজীবীদের পারিবারিক জীবন : প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষমতায়ন | ১৫৩ |
| খবির উদ্দীন আহম্মদ ॥ | দৈহিক মিলন : পক্ষদের অধিকার ও দায়বদ্ধতা | ১৭৩ |